আত্মজ্ঞান

স্বামী অভেদানন্দের

অপর বাংলা গ্রন্থাবলী

- হিন্দুনারী
- আত্মবিকাশ
- কাশ্মীর ও তিব্বতে
- স্তোত্র-রত্নাকর
- যোগশিক্ষা
- ভারতীয় সংস্কৃতি
- ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম
- শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম্ম
- পুনর্জ্জন্মবাদ
- কর্ম্মবিজ্ঞান

স্বামী শঙ্করানন্দ প্রণীত

- জীবন-কথা (স্বামী অভেদানন্দের জীবন-কাহিনী)
- শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত

আত্মজ্ঞান

স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
কলিকাতা

উৎসর্গ

যাঁহার করুণাবলে

আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়াছি

আমার সেই পরমারাধ্য গুরুদেব যুগাবতার ভগবান

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীচরণকমলে

ভক্তির সহিত এই গ্রন্থ উৎসর্গ

করিলাম।

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আত্মজ্ঞান লাভ করাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। আত্মা—যিনি জন্ম-মৃত্যু, ক্ষয়-বৃদ্ধি বা সমস্ত-কিছু পরিবর্ত্তন ও দ্বৈত বস্তুর সংস্পর্শ হইতে নির্মুক্ত সেই পূর্ণ ও অখণ্ড চৈতন্যসত্তার উপলব্ধির নামই 'আত্মজ্ঞান'। আত্মজ্ঞান উপলব্ধিরই স্বরূপ—'Self-knowledge is *realization.*' আমি সাধারণ হস্ত-পদযুক্ত মরণশীল মানুষ নই, কিন্তু অজর অমর ব্রহ্মস্বরূপ; আমি সকল বন্ধন ও সংশয়ের অতীত একমাত্র সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মা, এইরূপ স্থিরতা বা স্থিরবুদ্ধির নামই 'উপলব্ধি'। উপলব্ধি বা আত্মজ্ঞান লাভ হইলে শারীরিক কোন অঙ্গের পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন হয় না, সংসার বা সৃষ্টি যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহারও নাশ, বিলুপ্তি বা বৈলক্ষণ্য হয় না, যেমন আছে তেমনই থাকে, কেবল পরিবর্ত্তন হয় প্রত্যয়, জ্ঞান বা দৃষ্টিভঙ্গীর। দৃষ্টিভঙ্গীর এইরূপ দিব্য পরিবর্ত্তন সাধিত হইলেই বুঝিতে হইবে 'আত্মজ্ঞান' অধিগত হইয়াছে এবং যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি বর্ত্তমান শরীরে বিদ্যমান থাকিলেও অশরীরির মতনই বিচরণ করেন। এই অশরীরি অবস্থা যাঁহার লাভ হইয়াছে তিনিই জীবন্মুক্ত অর্থাৎ এই বর্ত্তমান রক্ত-মাংসের শরীর লইয়া জীবিত থাকিলেও তিনি মুক্ত ও জ্ঞানী।

আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান 'সাধিত হওয়া,' 'লাভ করা' বা 'প্রাপ্তি' এই সমস্ত কথা দার্শনিক যুক্তির নজিরে সম্পূর্ণ অসঙ্গত,

কারণ যাহা পূর্ব্বে কখনও করা হয় নাই তাহাকে রূপায়িত করার নামই 'সাধন করা' বা তাহাকে নিজের আয়ত্তে আনার নামই 'লাভ' বা 'প্রাপ্তি'। প্রকৃতপক্ষে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান এমন কোন-কিছু নূতন বস্তু বলিয়া সৃষ্ট হয় না যাহার সম্বন্ধে আমরা ঐ 'সাধিত হওয়া,' 'লাভ করা' বা 'প্রাপ্তি' শব্দগুলি ব্যবহার করিতে পারি। আত্মা আজও যেমন, কালও ঠিক তেমনই থাকিবেন; অতীতে তিনি একই রূপে বর্ত্তমান ছিলেন, আবার ভবিষ্যতে তিনি সমানভাবেই থাকিবেন, বিন্দুমাত্রও কোন পরিবর্ত্তন বা বিকার তাঁহাতে আসিবে না। সুতরাং এই যে অবিকারী নিরবচ্ছিন্ন এক ও অদ্বিতীয় সত্তারূপ জ্ঞান বা প্রকাশস্বরূপ চৈতন্য ইনিই প্রকৃতপক্ষে 'আত্মা' বলিয়া পরিচিত। এই আত্মা চৈতন্যরূপে যেমন আমাদের শরীরে আছেন তেমন সমস্ত জীব, জন্তু, বৃক্ষ-লতা, চন্দ্র-সূর্য্য এবং গ্রহ-উপগ্রহেও বর্ত্তমান। আত্মা চৈতন্যসত্তায় আমাদের সকলের শরীরে নিয়ন্তারূপে আছেন বলিয়াই আমরা যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করি; যেমন আমরা বলি 'আমরা 'আছি' 'আমরা করিতেছি' ইত্যাদি। এই যে আমাদের কার্য্য-সম্বন্ধে আমরা জানি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান থাকে—ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, আমিরূপ কর্ত্তা ও ক্রিয়া এই উভয়কেই যিনি জানিতেছেন বা দেখিতেছেন তিনিই চৈতন্যময় আত্মা; তিনি এই দুইটী হইতে পৃথক হইলেও আবার দুইটীতেই সর্ব্বদা অনুস্যূত হইয়া আছেন।

তথাপি প্রশ্ন হইতে পারে যে, আত্মা চেতন বা

চৈতন্যস্বরূপ হইলেও আমরা মানুষেই মাত্র তাঁহার প্রকাশ ও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু বৃক্ষ-লতা, গ্রহ-উপগ্রহ অথবা জড় বস্তুতে তাঁহার সত্তা স্বীকার করিব কেন? আমরা চেতনধর্ম্মী তাহাকেই বলি যাহা কথা কহিতে পারে, সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে পারে অথবা প্রশ্ন করিলে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। বৃক্ষ, লতা বা জড় পদার্থে ইহার কোনটীর লক্ষণ বা প্রকাশই তো দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহাদিগকে প্রাণহীন, অচেতনই বলিতে হইবে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী বলিবেন না, তাহা কেন? এই বিশ্ব-চরাচরে অচেতন বলিয়া কোন জিনিসই থাকিতে পারে না। বৃক্ষ লতা প্রভৃতিকে আমরা চেতন বলি কেননা তাহারাও বাঁচিবার জন্য জীবন-সংগ্রাম (struggle for existence) করিয়া থাকে; তাহাদেরও ক্ষয় বৃদ্ধি আছে, তাহারাও সুখ দুঃখ অনুভব করে, সুতরাং আত্মচেতনা বা প্রাণের লক্ষণ হইতে তাহারাও বঞ্চিত নয়। স্বর্গীয় স্যার জগদীশচন্দ্র বসু গাছের যে প্রাণ আছে একথা প্রমাণ করিয়াছেন উপনিষদে ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেও বৃক্ষ-লতার প্রাণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। মোটকথা যে বস্তুরই ক্ষয় ও বৃদ্ধি আছে, যে বস্তু প্রকৃতির পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা ও শক্তি প্রদর্শন করে সেই বস্তুই চেতন ও প্রাণবান। আমরা একটী প্রস্তর বা টেবিলকেও হয়তো অচেতন বলিয়াই অবজ্ঞা করিয়া থাকি, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখি একটি প্রস্তরে বা টেবিলে আঘাত করিলে তাহাও কিন্তু সেই আঘাত সহ্য করিয়া আবার প্রতিঘাত আমাদের

ফিরাইয়া দেয়; তাহার পরমাণুগুলির ভিতরও যথেষ্ট একতা বা সঙ্ঘবদ্ধতা আছে, কেননা আঘাত করিলেও তাহা কিন্তু বিচ্ছিন্ন বা শিথিল হইয়া ঝরিয়া পড়ে না, একই ভাবে আবদ্ধ থাকিয়া তাহার প্রাণের পরিচয় আমাদের নিকট জ্ঞাপন করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া তাহার পরমাণুগুলির সংহত অথবা একত্র হইয়া থাকিবার প্রচেষ্টা ও লক্ষণ হইতে প্রমাণ হয় যে, তাহাদেরও সংজ্ঞা আছে, তাহারাও চৈতন্যবান্ এবং জীবিত।

সকল জিনিসের ভিতর এই যে সংগ্রাম করিয়া সহ্য করিবার বা বাঁচিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি ও আকুলতা ইহাই হইল চেতনা বা প্রাণের লক্ষণ। এই প্রাণকেই উপনিষদে 'প্রজ্ঞা' বলা হইয়াছে। এই প্রজ্ঞাই বোধি বা জ্ঞান (higher intelligence or consciousness)। সমস্ত আপেক্ষিক জ্ঞানের অধিষ্ঠানই প্রজ্ঞা। আত্মা বা প্রজ্ঞা হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না কিন্তু আত্মা বা প্রজ্ঞা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপই। আচার্য্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার 'আত্মজ্ঞান' পুস্তকে এই তত্ত্বসমূহ সম্বন্ধেই সূক্ষ্ম বিচার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, সমস্ত জিনিসেরই 'প্রাণ' এবং 'প্রজ্ঞা' আছে, আর সকলেই আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। সংসারের বিচিত্র প্রবৃত্তি ও মোহরূপ অজ্ঞানের জন্যই আত্মচেতনা আমাদের আবৃত হইয়া আছে, আর সেজন্যই আমরা যে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব অপাপবিদ্ধ আত্মস্বরূপ এই জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা মোটেই সচেতন নই। কিন্তু মোহরূপ অজ্ঞান কি? আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে না জানার নামই

'অজ্ঞান'। এই অজ্ঞানের সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্কর বিচিত্র বিচারই ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাসভাষ্যে করিয়াছেন। অজ্ঞানকে তিনি বলিয়াছেন 'অধ্যাস'। একটি জিনিস যা—তাহাকে তাই বলিয়া দেখা বা জ্ঞান না করার নামই অধ্যাস। অধ্যাস ও অজ্ঞান একই। এই অজ্ঞান—অবিদ্যা, মায়া, পরমেশশক্তি, প্রকৃতি ইত্যাদি নামেও কথিত। কেহ কেহ আবার অজ্ঞানের ভেদ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন অবিদ্যা ও মায়া পরস্পর ভিন্ন। তাঁহারা বলেন ঈশ্বরে যে অজ্ঞান তাহার নাম 'মায়া' আর জীবাশ্রিত যে অজ্ঞান তাহার নাম 'অবিদ্যা'। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি ভাষ্যকারেরা অজ্ঞানের এই ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। বিবরণপ্রস্থান ও আচার্য্য শঙ্কর নিজে অজ্ঞানের ভেদ স্বীকার করেন নাই। শঙ্কর বলিয়াছেন বিদ্যা ও অবিদ্যা অজ্ঞানেরই নামান্তর। মোটকথা আত্মবিস্মৃতির নামই অজ্ঞান। স্বার্থ-পরতাকেও অজ্ঞান বলে। যেইদিন আমরা উপলব্ধি করিব যে, আমরা দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই, ইন্দ্রিয় নই, কিন্তু দেহ মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের স্বাক্ষীস্বরূপ আত্মা ও একমাত্র প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্ম সেইদিনই আমাদের দিব্য প্রত্যভিজ্ঞার উদয় হইবে, সেইদিনই আমরা আত্মজ্ঞান লাভ ফরিয়া ধন্য হইব।

কিন্তু মনের চিরচঞ্চল বিচিত্রমুখী গতি বা প্রবৃত্তিই আমাদের আত্ম-জ্ঞানলাভের পথে একমাত্র অন্তরায়। আমরা পার্থিব সুখরূপ আলেয়ার পশ্চাতেই ক্রমাগত ছুটিয়া চলিয়াছি। পৃথিবীর সম্পদ, বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্যকেই কেবল উপভোগ করিয়া সুখী হইব, আত্মা বলিয়া কোন বস্তু আছে কিনা জানিবার আমাদের আবশ্যকতা

নাই—এই যে অচল মনোবৃত্তি ইহাই আমাদিগকে সর্ব্বদা প্রবঞ্চিত করিতেছে। এই প্রবঞ্চনাই আসলে 'মায়া'। মায়ার অপর একটি নাম 'মন'। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার *Our Relation to the Absolute* পুস্তকেও (পৃঃ ১৯৩) উল্লেখ করিয়াছেন : "*but mind is also a delusion.*" প্রকৃতপক্ষে বাসনাই সংসার-বন্ধনের কারণ ; কিন্তু এই বাসনার কারণই আবার মন। মন আকাঙ্ক্ষা করে বলিয়াই বাসনার উৎপত্তি হইয়া থাকে ; মন স্থির হইলে আর বাসনার সৃষ্টি হয় না। এজন্য যোগী ও শান্তিকামী সাধকগণ মনকেই সংযত করিতে প্রথমে যত্ন করেন। এই যত্নকেই পাতঞ্জলদর্শনে 'অভ্যাস' বলা হইয়াছে, —'তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ' (১।১৩)। মন যখন পৃথিবীর নশ্বর ভোগকেই ইহসর্ব্বস্ব না ভাবিয়া আত্মচেতনাকেই কেবল ফিরাইয়া পাইতে চায় তখন সেই আন্তর প্রবৃত্তি বা প্রচেষ্টার নামই ভোগের বিপরীত ভাবনা। এইরূপ বিপরীত ভাবনার নামই আবার বিষয়-বিতৃষ্ণা অথবা বৈরাগ্য। মনকে আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য সাধনায় নিয়োজিত করিতে হয়। মন একবার আত্মানুসন্ধানে মগ্ন হইলে বাহিরের তুচ্ছ বস্তুর প্রলোভন ও চাকচিক্য তাহাকে আর মুগ্ধ করিতে পারে না ; তখন আত্মোপলব্ধি বা আত্মাকে জানিবার জন্যই মন যথার্থ আকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে। মনের এই আকুলতা ও পুনঃ পুনঃ চেষ্টার নামই 'সাধনা'।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে; অনন্তকাল ধরিয়া কামনার চরিতার্থরূপ ভোগে ডুবিয়া থাকিলে প্রকৃত শান্তির পথ

কণ্টকাকীর্ণই হইয়া উঠে; সুতরাং শাশ্বতী শান্তির একমাত্র প্রস্রবনই আত্মজ্ঞান। মন শান্ত ও স্থির হইলেই আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন: 'ব্রহ্ম বাক্য-মনের অগোচর, কিন্তু তিনি শুদ্ধ মনের গোচর।' এই শুদ্ধ মন ও মনোনাশরূপ শান্তি একই কথা। মন পরিশুদ্ধ হইলে আর মন থাকে না; মনের বৃত্তি লইয়াই তো মনের সার্থকতা? সুতরাং মন উপশান্ত হইলে আত্মচৈতন্যের দিব্যস্বরূপ সাধকের নিকট আত্মপ্রকাশ করে। সাধকের জীবন তখনই ঠিক ঠিক কৃতকৃতার্থতা লাভ করিয়া ধন্য হয়; আর এই কৃতকৃতার্থতা লাভের নামই 'আত্মজ্ঞান'।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আত্মজ্ঞানরূপ দার্শনিক তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচার এমনই সহজ সরল ভাষায় প্রাঞ্জল করিয়া এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, বুঝিবার বিষয়-বস্তু প্রকৃত দুরধিগম্য হইলেও সাধারণের নিকট ইহা সরস ও সুখবোধ্য হইয়াই উঠিয়াছে। আত্মজ্ঞানকে যে বাক্য ও মন দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও অহং যে যথার্থ আত্মার স্বরূপ নয় এ সমস্ত জটিল রহস্য তিনি সমস্ত দর্শন ও উপনিষদের—বিশেষ করিয়া ঈশ, কেন, কঠ, কৌষীতকি, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের আসল তত্ত্ব বিচার ও আখ্যানসমূহকে অবলম্বন করিয়া বিবৃত করিয়াছেন। এই বর্ত্তমান তৃতীয় সংস্করণের অনুবাদ স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত ও বিশেষভাবে মার্জ্জিত করা হইয়াছে। পাঠক পাঠিকাদের সুবিধার জন্য এবারে একটী বিস্তৃত সূচীপত্রও দেওয়া হইল। সত্যান্বেষী পাঠক

আত্মজ্ঞান

পাঠিকাগণের নিকট ইহা পূর্ব্বের ন্যায় সমাদর লাভ করিবে ইহা আমরা আশা করি। ইতি

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
কলিকাতা
৪ঠা কার্ত্তিক ১৩৫৩

প্রকাশক

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে জড়বাদ ও আত্মার অস্তিত্বে অনাস্থা জনসাধারণের মনোরাজ্যে এইরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, শিক্ষিত সমাজের অতি অল্পসংখ্যক লোকই অমর আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে যত্নবান হইয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দুদিগের সনাতন ধর্ম্মে ও বেদান্ত-দর্শনশাস্ত্রে আত্মজ্ঞান লাভ করাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বেদের অন্তর্গত উপনিষদ্‌সমূহে আত্মজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে। বৈদিক ঋষিগণ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া প্রচার করিয়াছেন যে, উহা দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মূল ভিত্তিস্বরূপ। তজ্জন্য আত্মজ্ঞানানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিবার প্রথম সোপানস্বরূপ আত্মানাত্ম-বিবেক এবং জড় ও চৈতন্যের পার্থক্য অনুভব করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ আমেরিকা মহাপ্রদেশের নিউ ইয়র্ক নগরীতে বেদান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া আত্মজ্ঞান বিষয়ে প্রাঞ্জল ইংরাজী ভাষায় যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা পুস্তকাকারে *Self-knowledge* নামে উক্ত সমিতি হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি আমেরিকা মহাপ্রদেশে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে।

আত্মজ্ঞান

স্বামিজী মহারাজ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়ে ঔপনিষদিক সত্যগুলি কিরূপ হৃদয়গ্রাহী ও সহজবোধ্যভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা তাঁহার পুস্তক পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য উক্ত *Self-knowledge* পুস্তকের বঙ্গানুবাদ স্বামিজী মহারাজের নিজ তত্ত্বাবধানে এক্ষণে প্রকাশিত হইল। আশা করি পাঠকবর্গ এই অমূল্যরত্নস্বরূপ 'আত্মজ্ঞান' লাভ করিয়া নিজ অমর আত্মার পরিচয় পাইবেন এবং দেহাত্মবোধ হইতে মুক্ত হইয়া শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতে সক্ষম হইবেন।

২২শে ফাল্গুন সন ১৩৪১
ইং ৬ই মার্চ্চ ১৯৩৫
বুধবার, শুক্লাদ্বিতীয়া

প্রকাশক

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

"তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ ;"—একমাত্র সেই আত্মাকেই উপলব্ধি কর এবং অন্য সব বৃথা অসার বাক্য পরিত্যাগ কর, মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার ইহাই একমাত্র সেতু—এই বাণীর দ্বারাই বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে একদা প্রাচীন ভারতের দিব্যদ্রষ্টা আর্য্যঋষিবৃন্দ মহামুক্তির ও অমৃতত্বলাভের পথে সমগ্র মানবজাতিকে উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে আহ্বান করিয়াছিলেন।

মানুষ অমৃতের সন্তান; সচ্চিদানন্দই তাহার প্রকৃত স্বরূপ। অবিদ্যার আবরণে দেহাসক্তি ও ইন্দ্রিয়পরবশতার জন্যই সে নিজেকে পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহমাত্র মনে করে। কিন্তু সে যে স্বরূপতঃ জন্মহীন মৃত্যুহীন শাশ্বত অব্যয় আত্মা—ইহা কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারে না। এইজন্যই রূপ-রস-গন্ধে পরিপূর্ণ প্রপঞ্চময় বহির্জগতের প্রতি তাহার চিত্ত সর্ব্বদাই আকৃষ্ট ও অভিভূত। আনন্দ নিত্য অসীম ও অনন্ত সত্তা যে তাহার মধ্যেই নিহিত, সে যে স্বয়ংই তাহা, স্বরূপ-বিস্মৃতির জন্য ইহা জানে না বলিয়াই সে আপাতরম্য ক্ষণিক সুখপ্রদ ও মহাদুঃখদায়ক ঐন্দ্রিয়িক বিষয়কে ভোগ করিয়া সুখী ও আনন্দিত হইতে চায়। কিন্তু বারবার সংসারের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে অবশেষে সে বুঝিতে পারে ইন্দ্রিয়পরবশতায় বা বিষয় উপভোগে শান্তি নাই, আনন্দ নাই, আছে শুধু দুঃখ ক্লেশ ও যন্ত্রণা। তাই

আর বিষয়-ভোগের আপাতরম্য চাকচিক্যে সে ভুলিতে চায় না, কোথায় যথার্থ শান্তি—কোথায় মুক্তি এই আকুলতা, এই অধীরতা, এই অন্বেষণেই তাহার স্বরূপকে জানিবার আগ্রহে সে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে।

কিন্তু এই মহামুক্তি ও শাশ্বতী শান্তির সন্ধান সে এই সংসারে কোথায় কাহার কাছে আর পাইবে? যাহারা তাহারই মতন বিষয়ের নাগপাশে বদ্ধ, বাসনার বিষে জর্জ্জরিত তাহারা কি করিয়া তাহাকে মহামুক্তির সুনিশ্চিত সন্ধান দিবে? এই মহামুক্তির—এই চিরশান্তির সম্যক্ সন্ধান একমাত্র সেই লোকোত্তর দেবমানবের নিকটই পাওয়া যায় যিনি সংসারের সকল বন্ধন হইতে বিমুক্ত এবং সাধনার সর্ব্বশেষ শিখরে উঠিয়া সমাধিসঞ্জাত প্রজ্ঞানেত্রে দেশ কাল নিমিত্তের পরপারে নিষ্প্রপঞ্চ পরম পরিপূর্ণ সত্যকে আত্মস্বরূপে সাক্ষাৎকারের দ্বারা পরমকল্যাণ ও আনন্দসত্তায় প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র সেই আত্মক্রীড় আত্মরতি জ্ঞানমূর্ত্তি লোকগুরুরই সান্নিধ্য, স্নেহ, করুণা, আশীর্ব্বাদ, শিক্ষা ও সহায়তায়ই শ্রদ্ধাবান মুমুক্ষু মানব আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা মহামুক্তি ও চিরশান্তিলাভে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হয়।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভ্যুদয়ে ভারতবর্ষের সুমহান আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সত্যতা আধুনিক যুগে জগতের সত্যান্বেষী মানবমাত্রেরই নিকট অভ্রান্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এই বিশ্বধর্ম্মমূর্ত্তি যুগগুরুর লীলাসহচর এবং তাঁহার অপরিমেয় আধ্যাত্মিক ভাব-সম্পদের অন্যতম উত্তরাধিকারী। যথার্থ জীবন্মুক্ত মহাযোগীর সমাধিলব্ধ আত্মজ্ঞান তাঁহার

স্বভাবসম্পদ ছিল বলিয়াই তিনি 'আত্মজ্ঞান' নামক গ্রন্থে আপনার অনুভূতির দুরধিগম্য তত্ত্বকে এমন অপূর্ব্বভাবে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আর সেইজন্যই তিনি এই 'আত্মজ্ঞান' গ্রন্থ পরমারাধ্য গুরুদেবকে উৎসর্গ করিতে গিয়া নির্ভীক ও অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন আপনার অপূর্ব্ব অনুভূতির কথা—"To the Lotus feet of Bhagavân Sri Râmakrishna, my Divine Guru, by whose grace the Bliss of Self-knowledge *is realized.*"—যাঁহার করুণাবলে আত্মজ্ঞানের অসীম আনন্দ অনুভব করিয়াছি আমার সেই দিব্যভাবময় গুরুদেব ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।"

সত্যই এই সুদুর্ল্লভ আত্মজ্ঞানের—এই অমিত আধ্যাত্মিক অনুভূতির সমুন্নত গিরিশিখরে সর্ব্বদা স্বগৌরবে সমাসীন ছিলেন বলিয়াই স্বামী অভেদানন্দের মুখনিঃসৃত বাণী এত শক্তিপ্রদ, প্রাণপ্রদ ও অগ্নিগর্ভ। এই আত্মজ্ঞানের দিব্যসম্পদে সমৃদ্ধ ছিলেন বলিয়াই তিনি ভারতবর্ষ, ইউরোপ ও আমেরিকায় বহু সত্যান্বেষী ধর্ম্মপিপাসু নর-নারীর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা সমস্যার সমাধান, ভ্রান্তি দূর, সংশয়-নিরসনের দ্বারা পরম সত্যলাভের পথপ্রদর্শক ও বরেণ্য ধর্ম্মগুরুরূপে তাহাদের চিরনমস্য।

প্রাচীন ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষিবৃন্দ আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির যে সাধনপন্থা নির্ণয় করিয়াছিলেন তাহা কোন দেশগত, জাতিগত ও সম্প্রদায়গত গোঁড়ামী, অন্ধবিশ্বাস, আচার ও অনুষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যুক্তি, বিচার ও বিশ্লেষণ দ্বারাই তাঁহারা

সত্যলাভের পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ঋষিদের প্রদর্শিত আত্মতত্ত্ব সাধনার যে বিচিত্র শিক্ষা ও পদ্ধতি তাহা পূর্ব্বাপর অকাট্য যুক্তির—অচল অটল ভিত্তির উপর স্থাপিত। স্বামী অভেদানন্দ আর্যঋষিবৃন্দের আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে ও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনের উদার উদ্ভিন্ন আলোকে বেদান্তের এই সুমহান তত্ত্বকে আধুনিক বিজ্ঞানের সমপ্রকৃতি বলিয়াই সমগ্র সভ্যসমাজের নিকট সগৌরবে ও মহাসাফল্যের সহিত প্রচার ও প্রমাণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থ তাঁহার সেই অপূর্ব্ব মনীষা ও অমিত অধ্যাত্ম সম্পদেরই অন্যতম নিদর্শন।

"আত্মজ্ঞান" পুস্তকটি তাঁহার *Self-knowledge* নামক ইংরাজী গ্রন্থেরই বঙ্গানুবাদ। এই গ্রন্থের বাঙলায় অনুবাদের সময়ে স্বামিজী মহারাজ স্বয়ং যে সমস্ত মন্তব্য ও ফুটনোট দিয়াছিলেন সেগুলি পূর্ব্ব সংস্করণের ন্যায় এবারেও অবিকল রাখা হইল। প্রথম সংস্করণে এই গ্রন্থ ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ও চিন্তাশীল পাঠকদের নিকট যে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল তাহা সত্যই আনন্দের বিষয়। বর্ত্তমানে সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট সমন্বিত ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আশা করি ধর্ম্মান্বেষী ও সত্যনিষ্ঠ পাঠকদিগের নিকট ইহা পূর্ব্বের মতই সমাদর লাভ করিবে। ইতি

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
কলিকাতা
২৪ শ্রাবণ ১৩৫০

প্রকাশক

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

"এতা দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং
দশ প্রজ্ঞামাত্রা অধিভূতং।
যদ্ধি ভূতমাত্রা ন স্যুর্ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্যু,
র্যদ্ধা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যুর্ন ভূতমাত্রাঃ স্যুঃ॥
ন হ্যন্যতরতো রূপং কিঞ্চন সিধ্যেৎ।"

—কৌষীতকী উপনিষৎ ৩।৮

জ্ঞেয় অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির সহিত বিষয়ীর (জ্ঞাতার বা আত্মার) সম্বন্ধ আছে এবং বিষয়ীরও (জ্ঞাতার বা আত্মারও) জ্ঞেয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ আছে। জ্ঞেয় বিষয় না থাকিলে জ্ঞাতা বিষয়ী থাকিত না এবং জ্ঞাতা বিষয়ী (আত্মা) না থাকিলে জ্ঞেয় বিষয়ও থাকিত না। এই দুইটির মধ্যে একটি না থাকিলে কেবল অপরটির দ্বারা কিছুই সম্পন্ন হয় না।

আত্মজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

জীব ও জগৎ

জীব ও জগৎ সম্বন্ধে বিচার সমগ্র সভ্য জগতেরই বিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের মুখ্য আলোচনার বিষয়। বিভিন্ন দেশের মনীষিগণ এই দুই শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ দুইটি নামের বিবিধ সংজ্ঞা প্রচলিত আছে, যথা জীব ও জগৎ (ego and non-ego), জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (subject and object), পুরুষ ও প্রকৃতি (soul or mind and matter), চেতন ও অচেতন ইত্যাদি। যুগে যুগে সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণই এই সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজ নিজ ভাব ও ধারণার অনুকূলে নানাবিধ যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, আত্মা, মন বা পুরুষ হইতেই অনাত্মা, জড় বা অচেতন পদার্থসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে।

আবার জড়বাদীরা বলিয়া থাকেন যে, অনাত্ম জড়পদার্থ হইতেই আত্মা, মন বা পুরুষের উৎপত্তি হইয়াছে। এই প্রকার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত হইতে এই নিখিল বিশ্বসৃষ্টিসম্বন্ধে নানাবিধ মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। ঐ মতগুলি সংখ্যায় অধিক হইলেও সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা, অধ্যাত্মবাদ বা বিজ্ঞানবাদ, জড়বাদ এবং অদ্বৈতবাদ। অধ্যাত্মবাদী বা বিজ্ঞানবাদিগণ বলেন যে, আত্মা বা মন জড়জগতের ও অচেতন শক্তির স্রষ্টা।[১] সুতরাং আত্মাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সর্ব্বপ্রকার পদার্থেরও সৃষ্টিকর্ত্তা। ইহাদের মতে অনাত্মা বা জড়জগৎ আত্মা বা চৈতন্যের একটি অবস্থান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। পক্ষান্তরে, জড়বাদিগণ বলেন যে, অচেতন, অনাত্মা বা জড় হইতেই চৈতন্যের বা আত্মার উদ্ভব হইয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সময়ে সময়ে বহু অধ্যাত্মবাদী বা বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক পণ্ডিতগণের আবির্ভাব হইয়াছে। ভারতবর্ষে, গ্রীসে, জার্ম্মানীতে এবং ইংলণ্ডে বিশপ্ বার্কলির[২] ন্যায় বহু বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদিগণ এই প্রতীয়মান বাহ্য

১। "মনো হি জগতাং কর্ত্তৃ মনো হি পুরুষঃ স্মৃতঃ॥"—যোগবাশিষ্ট।

২। বিশপ্ বার্কলি ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানবাদী (Idealist) দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার মতে বাহ্যিক জগতের যাহা কিছু সবই মন বা দ্রষ্টারই সৃষ্টি—*essi* is *percepi.*

জগতের এবং জড়ের সত্ত্বা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে এই জড়জগৎ সমস্তই মনের সৃষ্টি বা বিকাশমাত্র। আমেরিকার আধুনিক বিজ্ঞানবাদিরা বলেন যে, জগতে জড়-পদার্থ বলিয়া কোনও বস্তু নাই; সমস্তই মনের কার্য্য। ইহারা বিশপ্ বার্কলি এবং তাঁহার সমশ্রেণীভূক্ত অন্যান্য বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক পণ্ডিতের ধারণার অনুবর্ত্তী হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। আমেরিকা মহাদেশে এই বিজ্ঞানবাদীদের সিদ্ধান্ত আবার সম্পূর্ণ নূতন্; কারণ আমেরিকাবাসিগণ জগতের অপর জাতি অপেক্ষা আধুনিক কালের জাতি। আমেরিকাতে এপর্য্যন্ত কোনও প্রতিভাশালী বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক পণ্ডিতের আবির্ভাব হয় নাই। অপরপক্ষে আজকাল অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক, শরীরতত্ত্ববিৎ, পদার্থ-বিজ্ঞানবিৎ (physicist), রসায়নশাস্ত্রবিৎ, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং ক্রমবিকাশবাদী এই বিশ্বসম্বন্ধে জড়বাদেরই সমর্থন করিয়া থাকেন। সমস্ত পদার্থের উপাদানকারণ 'জড়পদার্থ'—ইহাই তাঁহারা দেখাইতে প্রয়াস পান। তাঁহারা আরও বলেন যে, জড়পদার্থ হইতে মন ও আত্মার উৎপত্তি হইয়াছে। যদিও জগতে অধিকাংশ লোকই এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন করেন এবং জড়বাদী বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন তথাপি তাঁহাদের ভিতর বোধ হয় অতি অল্পসংখ্যক লোকেই জড় অথবা অনাত্মার

স্বরূপ কি, কিম্বা অনাত্মা বা জড় বলিতে কি বুঝায় তাহা পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ করিতে পারেন না।

অনাত্মা বা জড়পদার্থটির স্বরূপ কি?—তাহা কেহ কি কখন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? জড়বাদিগণকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, আমরা কি জড় পদার্থ দেখিতে পাই? উত্তরে তাঁহারা বলিবেন—'না'; কারণ চক্ষুদ্বারা আমরা সাধারণতঃ যাহা দেখি তাহা 'বর্ণ' ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এই বর্ণ এবং জড় কি একই পদার্থ? না, তাহাও নয়; কারণ বর্ণ একটি গুণবিশেষ। কিন্তু উহা কোথায় থাকে? সাধারণ অজ্ঞ লোকের বিশ্বাস যে, পুষ্পের যে বর্ণ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহা পুষ্পের মধ্যেই নিহিত থাকে। শরীরতত্ত্ববিদ্গণ কিন্তু বলিবেন যে, আমরা যে বর্ণ দেখিতে পাই, তাহা পুষ্পে দেখা গেলেও পুষ্পে থাকে না। তাঁহাদের মতে উহা (বর্ণ) একটি অনুভবমাত্র। আমাদের চাক্ষুষ স্নায়ুবাহী চৈতন্যের সঙ্গে কোন বিশেষ একপ্রকার পরিস্পন্দনের সংস্পর্শ ঘটিলেই ঐ প্রকার অনুভব বা সংবেদনার সঞ্চার হইয়া থাকে। ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও সত্য। বর্ণানুভূতি একটি যৌগিক ক্রিয়ার ফল। ব্যোম-পদার্থে (ether) প্রথমে কম্পন হয়, পরে ঐ কম্পন চক্ষুর্দ্বার দিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং সেখানে যাইয়া ঐস্থানে কোষসমূহের মধ্যে আর এক

প্রকার কম্পনের সৃষ্টি করিয়া থাকে। বর্ণ এই উভয় প্রকার কম্পনের ফল। মস্তিষ্ককোষের এই কম্পন চৈতন্যের আলোকে আলোকিত হইলেই অনুভব বা সংবেদন আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অতএব, জড় ও চৈতন্যের সংমিশ্রণের ফলই বর্ণ। ইহা বাহ্য (objective) ও আন্তর (subjective) উভয় জগতের প্রদত্ত বস্তুর সমাবেশের ফল। সুতরাং দেখা গেল যে, বর্ণ পুষ্পে থাকে না; উহা অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্বর্ত্তী ঝিল্লী, চাক্ষুষ স্নায়ু ও মস্তিষ্ককোষের উপর নির্ভর করে; অতএব ঐ বর্ণ এবং জড় এক হইতে পারে না।

আমরা এরূপ জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, আমরা যে-শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকি তাহাও কি জড়বস্তু? না, প্রকৃত উহা জড়বস্তু নয়; উহা কোন এক বিশেষ প্রকার কম্পন ও মনের সজ্ঞান-ক্রিয়াশীলতার ফল। নিদ্রিতাবস্থায় শব্দ-কম্পন আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। সেখান হইতে শ্রবণকুশল স্নায়ুদ্বারা উহা মস্তিষ্ককোষে উপনীত হয়। কিন্তু তখনও আমরা শুনিতে পাই না, কেননা উপলব্ধিকরণক্ষম মন সেখানে না থাকায় কম্পন তখনও শব্দানুভবে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। অতএব শব্দ এবং জড়বস্তুও এক নহে। এইরূপে দেখান যাইতে পারে যে, আমরা যাহাকে 'জড়' বলিয়া থাকি, অন্যান্য ইন্দ্রিয়

দ্বারাও তাহার কোন পরিচয় ঘটে না। আর সেজন্যই আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, জড় কি? জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ জড়ের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন: "অনুভবের স্থায়ী সম্ভাবনাই জড় বা জগৎ।"[১] মনসম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছেন: "স্থায়ী বোধশক্তিই মন।"[২] এক্ষণে এই সংজ্ঞা দ্বারা আমরা বেশী কিছু বুঝিলাম কি? বরং বলিতে গেলে আরও গোলে পড়িলাম। যত কিছু গোল ঐ "সম্ভাবনা" (*'possibility'*) শব্দটিকে লইয়া। যাহা হউক উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, যাহাতে অনুভব-ব্যাপারটি স্থায়িরূপে সম্ভব হয় তাহাই মন বা চৈতন্য। অথবা এরূপও বলা যাইতে পারে যে, যাহা স্থায়িভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও যাহা অনুভূতি বা সংবদনের বিষয় তাহাই 'জড়' বা জগৎ এবং যাহা স্থায়ীভাবে অনুভব করে বা অনুভবের কর্ত্তা, তাহাই 'জীব'। যাহাতে অনুভব-ব্যাপারটি স্থায়িরূপে সম্ভব হয় তাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারে না; কেননা ইন্দ্রিয়গুলি অনুভবের দ্বার মাত্র, প্রকাশক নহে। জড় শুধু অনুভব-কার্য্যের সংঘটন করিয়া থাকে এবং উহাই জড়ের

১। John Stuart Mill defines *matter* as the "permanent possibility of sensation."

২। "Permanent possibility of feeling."

একমাত্র কার্য্য। যখন আমরা জড়জগৎকে পৃথকরূপে বুঝিতে চেষ্টা করি, কিম্বা যখন উহার কোন বিশেষ ব্যাপার আমরা অনুভব করিতে চাই তখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি আমাদিগকে কোন সাহায্য করে না। বর্ণানুভূতির পক্ষে চক্ষুরিন্দ্রিয় যন্ত্রস্বরূপ মাত্র। শব্দানুভূতির পক্ষে সেরূপ শ্রবণেন্দ্রিয় ও আঘ্রাণের পক্ষে নাসারন্ধ্র যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের যতটুকু ইন্দ্রিয়শক্তি, বাহ্যজগতের অনুভূতিও আমাদিগের নিকট ততটুকু হইয়া থাকে। সাক্ষাৎসম্বন্ধেই হউক আর পরোক্ষভাবেই হউক, যাবতীয় অনুভূতিই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়াশীলতার ফল। আমরা জানি যে, দেশ ও কালকে অবলম্বন করিয়াই জড় বিদ্যমান থাকে। আবার ইহাও জানি যে, জড়জগৎ নানাবিধ অনুভবের সংঘটন করে; কিন্তু তথাপি আমরা উহা দেখিতে বা স্পর্শ করিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে যাহাকে আমরা 'জড়' বলি তাহা চিরকালই অতীন্দ্রিয় অবস্থায় থাকিবে। একখানি চেয়ার, একখণ্ড কাষ্ঠ অথবা স্বর্ণ আমরা স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু স্বরূপতঃ জড়-বস্তুটাকে আমরা স্পর্শ করিতে পারি না। ইহা বড়ই বিচিত্র ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণ বা প্রস্তর কিন্তু জড়-পদার্থ নহে, উহা জড় হইতে উৎপন্ন মাত্র; কাষ্ঠ বা প্রস্তর ও জড়ের বিকার।

'জড়' শব্দের তথ্যটি চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। 'ম্যাটার' অর্থাৎ 'জড়' শব্দটি লাটিন ভাষার 'ম্যাটারিজ্' ('*materies*') শব্দ হইতে উৎপন্ন। 'ম্যাটারিজ্' অর্থে উপাদান। প্রথমে এই শব্দটি বৃক্ষের কাণ্ড বা গৃহাদি নির্ম্মাণ-কার্য্যের উপযোগী কড়িকাঠ, বরগা ইত্যাদি বস্তুর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত। ক্রমে ক্রমে ইহার অর্থের বিস্তৃতি ঘটিল এবং উহাতে লোকে কোন কিছুর উপাদানভূত দ্রব্যকেই বুঝিতে লাগিল। যখন একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তি গঠিত হইল তখন কাষ্ঠের উপাদান হইতে সেই মূর্ত্তিটির একটু প্রভেদ করিয়া ফেলা হইল। কিন্তু তাহা হইলেও মূর্ত্তিটি প্রকৃতপক্ষে কাষ্ঠ ব্যতীত আর কিছু নহে। প্রস্তর বা ধাতুময়ী মূর্ত্তির সম্বন্ধেও ঐরূপ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উপাদান বলিতে সেই দ্রব্য বুঝিতে হইবে যাহা হইতে কোন-কিছু গঠিত বা আকারিত হইতে পারে। ক্রমে এইরূপ প্রশ্ন হইতে লাগিল যে, কোন্ দ্রব্যের দ্বারা এই পৃথিবী গঠিত হইয়াছে? উত্তর হইবে—ম্যাটারিজ্ বা জড়ের দ্বারা। অতএব এই 'জড়' শব্দটিতে কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুকে বুঝায় না, তবে যে অজ্ঞাত দ্রব্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞাত বস্তুগুলি গঠিত হইয়াছে, জড় বলিতে আমরা তাহাই বুঝিয়া থাকি এবং ইহাই ঐ শব্দের মূল ও প্রকৃত অর্থ। কোন বস্তু বা আকারবিশিষ্ট পদার্থের মূলে যে অজ্ঞাত উপাদান

বিদ্যমান থাকে, জড় অর্থে তাহাই নির্দ্দেশ করে। উদাহরণ-স্বরূপ দেখা যায়, কথোপকথনের সময় আমরা ইংরাজীতে সচরাচর বলিয়া থাকি "হোয়াটিজ্‌ দি ম্যাটার?" "ইট্‌ ডাজ্‌ নট্‌ ম্যাটার," "ইম্‌পরট্যাণ্ট্‌ ম্যাটার," "ডিকেয়িং ম্যাটার" ইত্যাদি। এ কথাগুলির প্রত্যেকটিতেই অনির্দ্দিষ্ট কোন বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া ইংরাজী ভাষায় 'ম্যাটার' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব 'ম্যাটার' বা 'জড়' অর্থে কোন অজ্ঞাত বস্তুই বুঝিতে হইবে।

বিজ্ঞান ও দর্শন বলেন, যে অজ্ঞাত উপাদান হইতে যাবতীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্যের উদ্ভব হইয়াছে, জড় বলিতে তাহাই বুঝিতে হইবে। ইহা অতীন্দ্রিয় বস্তু হইলেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থেই ইহা অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। ইহা স্বয়ং দেশ কিম্বা কাল নহে, অথচ ইহা দেশকে ব্যাপিয়া আছে। কালেও ইহা অভিব্যক্ত হইতেছে এবং কার্য্য-কারণসূত্রে ইহা শৃঙ্খলিত নহে। যাহা হউক এতগুলি ভাব ঐ জড় শব্দটির অর্থে নিহিত আছে। যে উপাদানটি হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপায়িত হইয়াছে, যখন আমরা তাহার চিন্তা করি তখন আমাদের মনে হয় যে, উহা বিরাট্‌, মহান্‌, অপরূপ ও অদ্ভুত শক্তিশালী। সেই শক্তিই সদাসর্ব্বদা নানাভাবে প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু জড়পদার্থটি কি? সেটি এক, না বহু? উত্তরে বলিতে

হয়—উহা একই, উহা কখনও বহু হইতে পারে না। হর্ব্বার্ট স্পেন্সার্ বলেন: "শুদ্ধ জড়ের ধারণা করিতে হইলে আমাদিগকে একটি তুলনা দ্বারা উহা করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে, জড় ও দেশ (space) একই সময়ে অবস্থিত দুইটি ব্যাপার। জড় বাধা প্রদান করে, দেশ কোন বাধা প্রদান করে না।"[৩] এক্ষণে দেশ ও জড়ের পার্থক্য কি? তাহা দেখা যাক। দেশ একটি বিস্তার, ইহা কোন প্রকার বাধা প্রদান করে না। কিন্তু যাহা বাধা দেয় ও দেশের ভিতর অবস্থান করে তাহাই জড়। হর্ব্বার্ট স্পেন্সার্ আরও বলিয়াছেন: "জড় ও দেশ এই দুইটি বিশ্লেষণের অতীত মূলতত্ত্বের মধ্যে প্রতিরোধ বা বাধা দেওয়ার কার্য্যই জড়ের মুখ্যগুণ এবং ব্যাপকত্ব গৌণগুণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যখন আমরা কোনও বস্তু স্পর্শ করি তখন উহা আমাদের বাধা দেয় এবং হস্তের গতির প্রতিরোধক এমন কিছু আছে ইহা আমাদের উপলব্ধি হয়। কিন্তু যখন আমরা সেই বস্তু স্পর্শ করিয়া হস্তপ্রসারণ করি তখন এই বাধা বা প্রতিরোধের ভাব দেশের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়।" তিনি পুনরায় বলেন: "যাহা হইতে জড়ের

৩। *First Principles*, p. 140.

অস্তিত্বের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হয় তাহা এক প্রকার শক্তির কার্য্য বলিয়া আমাদের উপলব্ধি হইয়া থাকে; অর্থাৎ যাহা আমাদের মাংসপেশী সঞ্চালনের সময় তাহাতে অবস্থিত সুপ্তশক্তির প্রতিরোধ করে, সেই প্রতিরোধক শক্তির কথা স্বতঃই মনে জাগ্রত হয়। যে সুপ্তশক্তি ঐরূপ প্রতিরোধ করে তাহাকেই প্রকাশিত বা ব্যক্তশক্তি (force) বলা হয়। সুতরাং 'ম্যাটার', জড় বা অনাত্মা যাহাকে বলা যায় তাহা কেবল এই ব্যক্তশক্তিগুলি দেশের সহিত একপ্রকার ঘনিষ্ঠসম্বন্ধে আবদ্ধমাত্র—ইহাই বুঝিতে হইবে।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন: "ম্যাটার ও তাহার গতি ঐ শক্তিগুলিরই বিভিন্নপ্রকার অভিব্যক্তি মাত্র। জড় ও অনাত্মারূপ স্থূল পদার্থগুলি বাহ্যিক শক্তিসমষ্টি ও আমাদের মানসিক উপলব্ধিসমূহ একত্রে সংমিশ্রিত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে।" প্রতিরোধ বা বাধা অনুভব করিবার জন্য একজন সচেতন অনুভবকারী কর্ত্তা থাকা আবশ্যক। এই অনুভবকারী জ্ঞাতা বিদ্যমান থাকিলেই প্রতিরোধকারী শক্তিটি অনুভব করিতে পারা যায় এবং সেই শক্তি হইতেই জড় বা অনাত্মা সম্বন্ধীয় ধারণা আমাদের উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জড় কাহারও দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই। উহার সৃষ্টি কেহ কখনও দেখে নাই। কিছুই ছিল না, অকস্মাৎ জড়ের

সৃষ্টি হইল অথবা জড় ধ্বংস হইয়া যাইবে, তাহার কিছুই থাকিবে না, এরূপ কল্পনাও কেহ কখন করিতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে জড়জগৎ উৎপত্তি ও বিনাশশীল নহে। ইহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই এবং কখনও ইহার ধ্বংস হইবে না। জড়ের আরও অনেক প্রকার সংজ্ঞা আছে। কোন কোন পদার্থবিজ্ঞানবিদ্ (Physicist) বলেন: "যাহারই কেন্দ্রাভিমুখে প্রেরণ করিবার শক্তি আছে তাহাকেই জড় বলা যায়।" কিন্তু ইহাতেও আমরা জড়ের যথার্থ প্রকৃতি অবগত হইতে পারিলাম না। ইহাতে এইটুকু মাত্র বলা হইল যে, এমন একটি পদার্থ আছে যাহা আকর্ষণে সাড়া দিয়া থাকে। আর্ণ্‌ষ্ট্‌ হেকেল বলেন: "অসীম বিস্তৃত পদার্থই জড়জগৎ আর সর্ব্বগ্রাহিণী চিন্তাশক্তিই জীব।"

এইরূপ বহুপ্রকার সংজ্ঞা আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, যে মূল উপাদানে এই জগৎ গঠিত তাহাই 'জড়'; অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও মনের গোচর তাহাই জড়। এই জড় নিত্য জ্ঞেয়স্বরূপ এবং জীব বা মন সর্ব্বদাই চৈতন্যস্বরূপ জড়জগতের দ্রষ্টা বা জ্ঞাতারূপে বিদ্যমান। সুতরাং এখন আমরা এইরূপে উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারি যে, জীব দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা, আর যাহা উপলব্ধি করিতে হয়, ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝিতে হয়, জানিতে

হয়, তাহাই জড়। একটি বিষয়ী, আর অপরটি বিষয়। এই দুইটি পরস্পরে সর্ব্বদাই সংবদ্ধ থাকে। বাহ্যজগৎ বা জড় এক অর্দ্ধাংশ, অপর অর্দ্ধাংশ আধ্যাত্মিক জগৎ বা জীব। অতএব জড়বাদিদিগের অভিমত একদেশদর্শী ও অসম্পূর্ণ, কেননা উঁহারা বিষয়ের বিদ্যমানতা স্বীকার করেন বটে কিন্তু বিষয়ীর অর্থাৎ জীবের বা মনের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। বিষয়ীকে অবলম্বন করিয়াই বিষয় বর্ত্তমান থাকিতে পারে, অন্যথা পারে না—এ কথাটি জড়বাদিগণ অস্বীকার করেন। জড়বাদীদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ বিষয় ও বিষয়ী, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই উভয়ের স্বরূপ-বিভ্রমের উপরই জড়বাদের ভিত্তি। জড়বাদ বলে যে, জড়-জগৎ বা অনাত্মা হইতেছে জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয়, কিন্তু সেইসঙ্গে আবার ইহাও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে যে, এই জ্ঞেয় বিষয় হইতেই সেই জ্ঞাতা বিষয়ী উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহা কখনই হইতে পারে না। কারণ 'ক' কখনও 'ক'-এর অভাব হইতে পারে না। জড় বা অনাত্মা জ্ঞেয় পদার্থ বা জ্ঞানের বিষয় (objective)—এই ধারণা হইতে জড়বাদের আরম্ভ। কিন্তু জড়বাদ পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে যে, এই জ্ঞেয় জড় জগৎ বা অনাত্মা বিষয় হইতেই বিষয়ী বা জ্ঞাতাস্বরূপ আত্মার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এই মতে প্রথমেই স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে,

যাহাকে উপলব্ধি করিতে হয় অথবা যাহা অনুভবের বিষয়, তাহাকেই জড় বলে। ক্রমে এ কথাও স্বীকৃত হইয়াছে যে, এই জড় হইতে এমন কিছু উৎপন্ন হয়—যাহা অনুভবের জ্ঞাতা। কিন্তু এই কথা স্ববিরোধী ও অসঙ্গত। জড়বাদ (Materialism) যেমন একদেশদর্শী ও অসম্পূর্ণ, আদর্শবাদ (Idealism) অথবা বিজ্ঞানবাদও সেইরূপ। ইহাতে জড় বা বিষয়ের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে। ইহার মতে সবই 'মন'। বর্ত্তমান কালে খৃষ্টান সায়েন্স বলেন যে, 'সবই মন, জড় বা জগৎ বলিয়া কোন কিছু নাই। এ মতটিও জড়বাদের ন্যায় ভ্রম-পূর্ণ। জীব, মন বা অহং (ego) চিরকালই বিষয়ী; ইহা অনুভবের কর্ত্তা বা জ্ঞাতা। অনুভব-কার্য্যের অথবা জ্ঞানের বিষয় যতক্ষণ আছে ততক্ষণই উহার কর্ত্তাও থাকিতে পারে। একটির অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তাহা হইতে অপরটির অস্তিত্বও অনুমিত হইয়া থাকে। এইজন্য মনীষী কবি গ্যেটে (Goethe) যথার্থই বলিয়াছেন: "জীব ব্যতীত জড় থাকিতে বা কার্য্য করিতে পারে না; আবার জড় না থাকিলে জীবের অস্তিত্ব এবং কার্য্যকারিতাও সম্ভব হইত না।

অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বিষয়ী ও বিষয় এ দুইটি একই সর্ব্বব্যাপী সত্ত্বার (ব্রহ্মের) দুইটি ভাব। উহারা যেন ঐ সত্ত্বার দুইটি বিভাগ। ঐ সত্ত্বা অজ্ঞাত ও

অজ্ঞেয়। স্পিনোজা উহাকেই 'সাবষ্ট্যান্শিয়া' বা মূলতত্ত্ব বলিয়াছেন। হার্ব্বাট স্পেন্সার উহাকে "অজ্ঞেয়" আখ্যা দিয়াছেন। উহাই ক্যাণ্টের অজ্ঞাত ও বিশ্বোত্তীর্ণ সত্তা (Thing-in-itself)।

প্রাচীন গ্রীক-দার্শনিক প্লেটো ইহাকেই "সর্ব্বোত্তম" (Good) আখ্যা দিয়াছেন এবং আমেরিকান দার্শনিক এমার্সন ইহাকেই "পরমাত্মা" (Over-soul) বলিয়াছেন; আর বেদান্তের মতে ইনিই "ব্রহ্ম"; ইনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেই সনাতন সত্যস্বরূপ যাহা হইতে স্থূল, সূক্ষ্ম, জড় বা অনাত্মা, আত্মা সমস্তেরই উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা "একমেবাদ্বিতীয়ং" অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয়; বহু নহে। বিশ্বচরাচর সৃষ্টির প্রারম্ভে সর্ব্বপ্রকার জাগতিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় এই এক ব্রহ্মসত্তা হইতেই উদ্ভূত হয় এবং প্রলয়কালে তাহারা সকলে সেই ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যায়। এই অনন্ত আধারস্বরূপ ব্রহ্মে মায়া বা প্রকৃতি অভিন্নরূপে অবস্থিত ছিল এবং সেই প্রকৃতি হইতেই প্রকাশমান যাবতীয় শক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। এই প্রকৃতিকেই আদ্যাশক্তি, মহামায়া, জগন্মাতা ইত্যাদি নাম দেওয়া হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রমাণিত মত হইতে আমরা জানিয়াছি যে, জগতের দৃশ্যমান যাবতীয় শক্তি একটি অন্যের সহিত আপেক্ষিকভাবে সংশ্লিষ্ট এবং ইহারা সেই নিত্য ব্রহ্ম ও তাঁহার নিত্যা প্রকৃতিরই অভিব্যক্তি মাত্র।

উপনিষৎ বলেন :

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।"[১]

এই মূলসত্তা হইতে প্রাণ, সর্ব্বপ্রকার মানসিক ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়শক্তি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসকল এবং ভৌতিক শক্তিসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে ও নানাভাবে ও নানা আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে।

ইহাই একত্ববাদ। বর্ত্তমানকালে জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক আর্ণেষ্ট হেকেল্ প্রমুখ একত্ববাদিগণ স্বীকার করেন যে, ঐ নিত্য বস্তুই জড়, চেতন এবং সর্ব্বপ্রকার শক্তিসমূহের উদ্ভবের হেতু। তাঁহারা বেদান্তের মহান্ সত্য "এতস্মাজ্জায়তে" ইত্যাদি বাক্যও স্বীকার করিয়াছেন। সেই এক অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম হইতে এক দিকে জীবনীশক্তি অর্থাৎ প্রাণ, মন, মানসিক ক্রিয়াসমূহ এবং যাবতীয় ইন্দ্রিয়শক্তিসমন্বিত জীব উৎপন্ন হইয়াছে, অপর দিকে জড়রাজ্যের অন্তর্গত দেশ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি আপঃ (তরল) ও পৃথিবী অর্থাৎ কঠিন পদার্থ (solid) প্রভৃতি স্থূল পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে। এক কথায়, সেই অনাদি ব্রহ্ম হইতেই একদিকে জীবাত্মার ও অপরদিকে অনাত্মা বা জড় জগতের বিকাশ হইয়াছে। বেদান্তের এই অদ্বৈততত্ত্ব। পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক

১। মুণ্ডকোপনিষৎ।২।১।৩

বিজ্ঞানবাদী পণ্ডিতগণও সমর্থন করিতেছেন। 'ম্যাটার' অথবা জড় জগৎকে অতি সূক্ষ্মাবস্থায় বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহা সর্ব্বাধার বা আধারভূত সেই অসীম ব্রহ্মসত্তাতেই পরিণত হইয়া থাকে। সেইজন্য বেদান্ত বলিয়াছে যে, এই অসীম অনন্ত ব্রহ্মসত্তাই নিখিল বিশ্বের অনাত্মা এবং আত্মা, অচেতন ও চেতন এই দুই ভাবের মূলে বিদ্যমান। সেই ব্রহ্মই বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। যদিও ইহা এক ও অদ্বিতীয় তথাপি ইহা অনির্ব্বচনীয় মায়াশক্তির প্রভাবে বহুরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। আর ইহাই বেদান্তের 'মায়া'।

এই জগৎ কেবলমাত্র অচেতন পদার্থে রচিত নহে অথবা উহা পরমাণুসমষ্টির সমবায়ের ফলও নহে। এযাবৎ কাল পাশ্চাত্যদেশীয় পদার্থবিজ্ঞানবিৎ, রাসায়নিক এবং অপরাপর জড়বাদিগণ বিশ্বাস করিতেন যে, পরমাণুগুলির প্রত্যেকটি অবিভাজ্য পদার্থ এবং উহারা অনন্ত অসীম আকাশে ভাসিতেছে। উহারা পরস্পরের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তির অধীন হইয়া ঘুরিতেছে; উহারা স্বতঃই যাবতীয় নৈসর্গিক বস্তু উৎপাদন করিতেছে এবং উহাদিগের দ্বারাই এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে সুবিখ্যাত ইংরাজ বৈজ্ঞানিক জে. জে. টম্‌সন্ বিদ্যুৎপ্রবাহের প্রয়োগ-পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে, তথাকথিত অবিভাজ্য

পরমাণুকেও সূক্ষ্মতর অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই-রূপ সূক্ষ্মতর অংশকেই 'ইলেক্ট্রন ও 'প্রোটন', বিদ্যুতিন্ অথবা বিদ্যুৎমাত্রা বলে ; এবং ইহা প্রাচীন হিন্দু বৈজ্ঞানিকদিগের তন্মাত্রা অথবা শক্তিকেন্দ্র ভিন্ন অপর কিছুই নহে। যদি পরমাণুগুলি 'ইলেক্ট্রন'-এরই সমষ্টি হয় এবং 'ইলেক্ট্রন'গুলিই তন্মাত্রা অথবা শক্তিকেন্দ্র হয় তাহা হইলে উহারা কোথায় থাকে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বেদান্ত বলে যে, তাহারা অনাদি ও সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী অব্যক্ত প্রকৃতির আধার সেই ব্রহ্মস্বরূপ অনাদি অনন্ত কারণসমুদ্রের মধ্যেই অবস্থিত রহিয়াছে। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, 'ম্যাটার', জড় বা জগৎ এবং শক্তি বা মায়া সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ মহাকারণের সহিত কিরূপ অভিন্নভাবে সম্বন্ধ। ইহার এক অংশ বা বাহ্য দিক হইতেছে ম্যাটার, অথবা জড়জগৎ, জ্ঞেয় বা বিষয় এবং অপর অংশ আন্তর দিক যাহাকে আমরা জ্ঞাতা ও বিষয়ী আত্মা বলিয়া থাকি। ইতিপূর্ব্বে আমি বলিয়াছি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে যে, জড়ের সৃষ্টিও নাই আর বিনাশও নাই। শক্তিও সেইপ্রকার উৎপত্তি ও ধ্বংসহীন। জড় ও শক্তিকে নানাবিধ আকারে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে, কিন্তু কখনই উহাদিগের ধ্বংসসাধন করা যায় না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি জগতের এক অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ জড় বা জাগতিক

শক্তি উৎপত্তি ও বিনাশশূন্য হয় তবে জীবের প্রকৃতি কিরূপ হইবে? উহাও কি উৎপত্তি ও বিনাশশীল হইবে? যদি বিশ্বের বহির্বিকাশের উৎপত্তি ও বিনাশ না থাকে তবে অপর অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ মন বা জীবই কেমন করিয়া জীবন ও মরণের অধীন হইতে পারে? না, উহা অসম্ভব। স্বরূপতঃ জীব অথবা মনেরও উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। জড়জগৎ বা বিষয় যদি অনাদি, শাশ্বত ও অবিনাশী হয় তবে জীব অথবা বিষয়ীও অনাদি ও অবিনশ্বর হইবে। জীব নিত্য ও অবিনশ্বর না হইলে জড়ের নিত্যত্বও তাহা হইলে অসম্ভব হইয়া পড়ে। জীব বা বিষয়ী নিত্য না হইলে জড়শক্তি যে অবিনশ্বর তাহার সন্ধান অথবা পরিচয়ই বা কে লইবে? বিভিন্ন দেশের অধিকাংশ বিখ্যাত মনীষী ও বৈজ্ঞানিকই এই বিচার্য্য বিষয়টুকু যেন উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। জড়জগৎ ও তাহার শক্তি বা বিকাশের চির-স্থায়িত্ব ভাবিতে গেলেই জীব বা মনের চিরস্থায়িত্বের কথাই আগে মনে আসিয়া পড়ে। একটির নিত্যত্ব বা চিরস্থায়িত্ব অসিদ্ধ হইলে একটির সঙ্গে সঙ্গে অপরটির নিত্যত্বও নষ্ট হইয়া যাইবে। তাই জীব ও জড়ের চরম বিশ্লেষণ করিয়া জানা গিয়াছে যে, উভয়েই উৎপত্তি ও বিনাশশূন্য এবং উভয়েই শাশ্বত ও সনাতন। যদি আকর্ষণ ও বিকর্ষণ-শক্তিযুক্ত একটি চুম্বকের এক প্রান্ত অপরিবর্ত্তনশীল

হয়, তবে অপর প্রান্তেরও ঐরূপ হওয়া আবশ্যক। আবার উহার যে স্থলে উভয়বিধ শক্তি মিলিত হইয়াছে সে মধ্যবর্ত্তী ও নিরপেক্ষ কেন্দ্রটিরও (neutral point) অপরিবর্ত্তনশীলতা স্বীকার করিতে হইবে। এই বিশ্ব যেন একটি প্রকাণ্ড চুম্বক পাথরের ন্যায়। উহার একটি দিক যেন জড়জগৎ বা বিশ্ব ও অপর দিক জীব এবং ব্রহ্ম যেন ইহাদের উভয়ের মিলনস্থল। সুতরাং বলিতে গেলে এই তিনটিই অর্থাৎ জড়জগৎ, জীব ও ব্রহ্ম অপরিবর্ত্তনশীল।

বেদান্তে চৈতন্যময় বিষয়ী, দ্রষ্টা ও জ্ঞাতার স্বরূপকে 'আত্মা' বলা হয়। এই আত্মাই আমাদের সকলের যথার্থ স্বরূপ। এই আত্মা অনাদিকাল হইতে আছেন এবং ভবিষ্যতে অনন্তকাল পর্য্যন্তও থাকিবেন; কেহই ইহার ধ্বংস বা বিনাশ সাধন করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যজগতের আকারসমূহ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু শাশ্বত আত্মার কোনপ্রকার কোনদিন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। ইহা সম্পূর্ণরূপে নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। সেই কারণ গীতায় (২।২৩) উক্ত হইয়াছে:

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥"

'অস্ত্র এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে বিগলিত করিতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ইনি অচ্ছেদ্য,

অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, অবিকারী এবং অবিনশ্বর ; দেহের মৃত্যু হইলেও আত্মার কখনও নাশ হয় না। যাহা-কিছু দেশ ও কালের অধীন তাহাই ধ্বংসশীল অর্থাৎ মৃত্যুর অধীন ও নশ্বর। যে সকল বস্তুর আকার আছে তাহার মৃত্যুও আছে ; কেননা "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" (২।২৭) ; জন্ম হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি আছে তাহারই ধ্বংস আছে। আমাদের শরীরের জন্ম হইয়াছে, সেজন্যই ইহার মৃত্যু হইবে। দেহের আকার সর্ব্বদা দেশ ও কালের অধীন। কিন্তু আত্মার কখনও মৃত্যু হইতে পারে না, কারণ ইনি অজ অর্থাৎ জন্ম-রহিত এবং দেশ ও কালের অতীত। আত্মা কখনও দেশ ও কালের অধীন নহেন। যদি আমাদের আত্মার উৎপত্তি বা জন্মের বিষয় অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করা যায় তাহা-হইলে আমরা কখনও উহার উৎপত্তির সন্ধান পাইব না ; সুতরাং ইহা সত্য যে, আত্মা আদিরহিত এবং অন্তহীন। যে সমস্ত পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাদেরই কেবল পরিবর্ত্তন হইবে এবং কালে তাহাদেরই নাশ হইবে, কিন্তু আত্মা চিরকাল একভাবেই থাকিবে, কারণ আত্মা অজর, অমর ও শাশ্বত।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই চৈতন্যময় আত্মা এক কি বহু ? এই এক রকমেরই প্রশ্ন জড় বা অনাত্মা

সম্বন্ধেও আবার জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, জ্ঞেয় বিষয়, জড়জগৎ বা অনাত্মা যদিও দেশ এবং কালের অধীন থাকিয়া নানাভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে তথাপি উহা পরমার্থতঃ একই বস্তু ও নিত্য। বেদান্তের মতে জ্ঞেয় বিষয় বা জগৎ বিচিত্র ও নানা, কিন্তু জগতের জ্ঞাতা, বিষয়ী বা আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। সেই সর্ব্বব্যাপী জ্ঞাতা পরমাত্মা আবার এই নিখিল বিশ্বের প্রাণ বা আত্মারূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং ক্ষুদ্র জীবাত্মাসমূহ তাঁহারই ক্ষুদ্র অংশরূপে প্রকাশিত হইতেছে।[১] যে পরমাত্মা, পরমেশ্বর বা বিরাটপুরুষ জীবাত্মারূপ অংশ-সমূহের পূর্ণ সমষ্টিস্বরূপ। সেই বিরাট-পুরুষই অনাদি-কাল হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র বিষয়ী এবং জ্ঞাতা। তিনিই একমাত্র বিশ্বাত্মা এবং তাঁহাতেই সমস্ত জীবাত্মা অংশরূপে অবস্থান করিতেছে। তিনিই এক, অদ্বিতীয় ও অনন্তসত্তারূপ অখণ্ড চৈতন্য সমুদ্র; তাঁহাতেই অসংখ্য আবর্ত্তের ন্যায় এই ব্যষ্টি জীবাত্মাসমূহ অবস্থিত রহিয়াছে। সেই বিরাটপুরুষই আবার প্রথমজ হিরণ্যগর্ভ বলিয়া ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছেন; যেমন "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে, ভূতস্য জাত পতিরেক আসীৎ;" অর্থাৎ ইনি বিশ্বের বিধাতা ও পতিরূপে ব্রহ্ম হইতে প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনিই

১। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"—গীতা ১৫।৭

নির্গুণ পরব্রহ্মের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বোত্তম বিকাশ; আবার ইনিই সগুণ-ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। ইঁহাকে আশ্রয় করিয়াই প্রকৃতি ক্রম-বিকাশের অগণিত স্তর দিয়া এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ভাবটি গীতায় আরও পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে, যেমন: "মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্" (১৪।৩১)। ইনি জ্ঞাতা, বিষয়ী, আত্মা এবং চৈতন্যকে জ্ঞেয়, বিষয়, অনাত্মা ও জড়জগৎ হইতে পৃথক করিয়াছেন। উপনিষদে পুনরায় বলা হইয়াছে:

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ব্রহ্মেতি।"[২]

ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে এবং অবশেষে তাঁহাতেই লীন হইবে। ব্রহ্মই সর্ব্বশক্তিমান। সমস্ত জীবসমষ্টি অপেক্ষাও ইনি অধিকতর শক্তিশালী। কিন্তু আমাদের শক্তি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। আমাদের জ্ঞান যেরূপ সীমাবদ্ধ, আমাদের শক্তিও তদ্রূপ আবার সীমাবদ্ধ; কিন্তু পরমেশ্বরের মহতী শক্তির কোন আদি ও অন্ত নাই। ঈশ্বরের এই মহাশক্তির বিকাশ সর্ব্বত্রই বিরাজিত এবং আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সেই

২। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ৩।১

শক্তি নিহিত ও ক্রিয়াশীল। এই ব্রহ্মই অনন্ত জ্ঞানের আধার এবং ইনিই স্বরূপতঃ আমাদের আত্মার আত্মা। সকলেরই এই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের পূজা ও ধ্যান করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। এই ধ্যানের সহায়তাই আমরা জীব ও জগতের এবং পরমেশ্বরের সহিত কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে পারিব। এই পরমেশ্বরই নিত্য ও সকলের আধার। যেমন,

"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥
"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতানাং
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্॥"[১]

অর্থাৎ ইনি সমস্ত চলমান এবং অনিত্য নাম ও রূপাদির মধ্যে একমাত্র নিত্যবস্তু। ইনিই সমস্ত চেতন পদার্থের একমাত্র আকরস্বরূপ। ইনিই সেই একই বস্তুকে বহুভাবে প্রতিভাত করান এবং বিশ্বের সকল জীবের অন্তরস্থিত সমস্ত কামনাকে পূর্ণ করিয়া থাকেন। ইহাকে হৃদয়াকাশে উপলব্ধি করিতে পারেন যে সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহারাই একমাত্র এই জীবনেই শাশ্বতী শান্তি লাভ করেন।

১। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।১২-১৩

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥"
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গোচর স্থূল এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর সূক্ষ্ম জগতের সমস্ত পদার্থতেই পরিব্যাপ্ত আছেন। সেই পূর্ণস্বভাব অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম হইতে এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগৎ বাদ দিলেও যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাও সেই অনন্ত ব্রহ্ম। ইহাতে ব্রহ্মের পূর্ণতার কোন হানি হয় না। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আত্মানুভূতি

ঈশ্বর-বিষয়ক উপলব্ধি বা জ্ঞান অপেক্ষা আত্মা-বিষয়ক জ্ঞানের কথাই সচরাচর ও বহুলভাবে ভারতবর্ষের সমগ্র জন-সমাজে আলোচিত হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানই সেই নির্ব্বি-শেষ ব্রহ্মের বা পরম পুরুষের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয়। সাধারণতঃ 'আত্মা' বলিতে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র 'অহং' বা 'আমি'-কেই বুঝিয়া থাকি, কিন্তু 'আত্মানুভূতি' বলিতে কেবল আমাদের এই 'অহং' বা 'আমি-'র জ্ঞানকে বুঝায় না। আমাদের ইহা অবশ্য সত্য যে, শরীরস্থিত 'অহং' বা জীবাত্মাই এই সকল কার্য্যের কর্ত্তা, সকল চিন্তার মননকর্ত্তা এবং জ্ঞাতারূপেই রহিয়াছেন। যিনি শরীর এবং মনের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করেন তিনিও 'অহং' বা 'জীবাত্মা' বলিয়াই পরিচিত; কিন্তু এই জীবাত্মা সর্ব্বজ্ঞানের একমাত্র আকরস্বরূপ পরব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব মাত্র। এই পরমাত্মার চিৎ-শক্তি বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হওয়াতে জীবাত্মা শক্তিমান্ হইয়া উঠে এবং শারীরিক ও মানসিক যাবতীয় কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং আত্মজ্ঞান বলিতে কেবল

দেহাত্মাভিমানী 'অহং'-জ্ঞানকে না বুঝিয়া সেই মহান্ আত্মার বা ব্রহ্মের সম্বন্ধে জ্ঞানকেই বুঝিতে হইবে।

জীবের যথার্থ স্বরূপই পরমাত্মা, তবে সাধারণতঃ জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ বলা যাইতে পারে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন: "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"[১] সুতরাং জীবাত্মা এই পরিদৃশ্যমান জগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ বিশ্বাত্মার সহিত অভিন্ন। সেই মহান্ আত্মাই ব্রহ্মাণ্ডের পারমার্থিক সত্ত্বা এবং দেশ ও কালের অতীত 'পরমাত্মা' নামে অভিহিত হন। ইনি প্রকৃত নিরাকার এবং অপরিবর্ত্তনশীল পরব্রহ্ম।

পরমাত্মা যখন ব্যষ্টিভাবে বা 'অহমস্মি' ইত্যাকার ক্ষুদ্র 'আমি'-জ্ঞানবিশিষ্ট জ্ঞাতারূপে প্রকাশিত হন তখন ইহাঁকে 'জীবাত্মা' বলা হয়। ইনিই যখন আবার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞেয় পদার্থরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন তখন তাঁহাকে 'জড় পদার্থ' বলা হয়। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম জড় পদার্থ ও জীবাত্মা এই দুই হইতেই অতীত। ইনিই অন্তর্য্যামীরূপে জীবাত্মার অন্তরে সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন এবং ইনিই আমাদের অস্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ এবং আত্মা। যখনই আমাদের এইরূপ আত্মানুভূতিলাভ হইবে তখনই আমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হইবে এবং তখনই এই বহির্জগতের সহিত আমাদের কি

১। গীতা ১৫।৭

সম্বন্ধ তাহাও বুঝিতে আমরা সক্ষম হইব। স্বরূপ সম্বন্ধে আত্মাকে সাক্ষাৎকার করাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

কেহ কেহ মনে করেন যে, আত্মার বিলুপ্তিসাধনই বেদান্ত-দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু এই ধারণা ঠিক্ নহে। বেদান্তের মতে আত্মার কখনও ধ্বংস নাই; আত্মা অবিনাশী। যদি আত্মার বিনাশসাধনই বেদান্তের মুখ্য উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে আত্মা পরিবর্ত্তনশীল ও বিনাশী হইতেন এবং আত্মা ও ব্রহ্ম কখনও অভিন্ন হইতেন না। পক্ষান্তরে বেদান্তদর্শন এই কথাই বলে যে, আত্মা সর্ব্বতোভাবে অপরিবর্ত্তনশীল ও অবিনাশী। সুতরাং ইহা সত্য হইলে কি প্রকারে আত্মার আত্যন্তিক অভাব বা বিনাশের কথা উঠিতে পারে? ব্রহ্মের বিনাশসাধন যেরূপ অসম্ভব, আত্মার বিনাশসাধনও সেরূপ অসম্ভব; সুতরাং আত্মার বিনাশসাধন কখনও জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হইতে পারে না।

একমাত্র আত্মানুভূতি বা আত্মজ্ঞানের সাহায্যেই আমরা চরম সত্যের উপলব্ধি করিয়া পূর্ণতা লাভ করিতে পারি। বেদে ইহা সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান বলিয়া বিদিত। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস্ যখন ডেলফি নগরের মন্দিরে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন: "সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি?" তখন প্রত্যুত্তরে তিনি দৈববাণীতে শুনিতে পাইয়াছিলেন: "তোমার আত্মাকে

জ্ঞান।” সুপ্রাচীন বৈদিকযুগ হইতে ভারতে এই আত্মানুভূতি বা আত্মজ্ঞানের মহিমা বর্ণিত হইয়া অসিতেছে। বেদান্ত অর্থাৎ বেদের জ্ঞানকাণ্ডের কথাও এই যে, আত্মজ্ঞানই জীবনের চরম লক্ষ্য। আমরা যদি ঈশ্বরলাভ করিতে বা তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদের আত্মাকে জানিতে বা উপলব্ধি করিতে হইবে। আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে এই প্রশ্ন জাগাইতে হইবে যে, আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি? আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি? মৃত্যুর পরেই বা আমাদের কি হইবে? এই প্রশ্নগুলির একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। সাধারণ লোক কিন্তু এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে পারে না, কারণ তাহাদের মন জাগতিক ব্যাপারেই লিপ্ত হইয়া থাকে। প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের কথা স্বতন্ত্র; কারণ তাঁহারা বাস্তবিকই সত্যস্বরূপ ভগবানকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হন। জাগতিক পদার্থ-বিষয়ে তাঁহারা বিতৃষ্ণ এবং যতক্ষণ বিশ্বের প্রকৃত রহস্য জানিতে না পারেন ততক্ষণ তাঁহারা চেষ্টা করেন। আত্মার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ঐ সমস্ত প্রশ্নগুলির সমাধান করাই তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য। এই জড়জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া যতই স্তরে স্তরে তাঁহারা আত্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন ততই তাঁহারা পরমার্থ সত্যের নিকটবর্ত্তী হন এবং পরিশেষে সেই

সত্যকে উপলব্ধি করিয়া বুঝিতে পারেন যে, সেই সত্য বস্তু তাঁহাদের আত্মা হইতে অভিন্ন। আত্মাই বিশ্বের একমাত্র কারণ ও কেন্দ্রস্বরূপ। দৃষ্টান্তস্বরূপে এই পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বা বাহ্যজগৎকে একটি সুবৃহৎ বৃত্তের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই বৃত্তের পরিধি যেন স্থূল জড় পদার্থসমূহ এবং ইহার কেন্দ্র অবিনশ্বর আত্মা। বেদান্ত বলেন এই আত্মা কখনও কাহারও অথবা কোন পদার্থের দ্বারা সীমাবদ্ধ হন না; ইনি অসীম। আত্মা অনন্ত ও অবিচ্ছিন্ন, কারণ ইনি দেশ ও কালের অতীত; কালের দ্বারা আত্মাকে নিরূপণ করিতে পারা যায় না বা দেশের দ্বারা আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন করা যায় না। জগতের ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত শাস্ত্রের মতে ঈশ্বরই এই নিখিল বিশ্বের একমাত্র অধিষ্ঠান। কিন্তু বেদান্তের মতে আত্মা নিজেই এই সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে আত্মা ও ঈশ্বর অভিন্ন। যে মুহূর্ত্তে আমাদের আত্মানুভূতি বা ঈশ্বরানুভূতির প্রকাশ হইবে সেই মুহূর্ত্তেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র এবং বহু দূরবর্ত্তী গ্রহ-উপগ্রহ—যে সমস্ত জ্যোতিষ্ক হইতে আলোকরশ্মি পৃথিবীতে আসিতে শতসহস্র বৎসরেরও অধিক সময় লাগে এই আত্মা সে সমস্ত বস্তুতেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তাহারপর পাঞ্চভৌতিক স্থূল জগতে অথবা সূক্ষ্ম মনোরাজ্যেও যেখানেই যে কোন প্রকারের সত্ত্বা বা অস্তিত্ব বর্ত্তমান সেখানেই আত্মার

প্রকাশ আছে বুঝিতে হইবে। যে চৈতন্যের দ্বারা আমরা বহির্জগতের অস্তিত্ব অনুভব করি এবং যাহার দ্বারা আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের শক্তিসমূহকে অনুভব করিতে পারি তাহাই প্রকৃত আত্মা। ইনি আমাদের নিকট হইতে দূরে অবস্থিত না থাকিলেও আমাদের মন ও বুদ্ধি তাঁহাকে ধরিতে পারে না। শুক্লযজুর্ব্বেদীয় ঈশোপনিষদে উক্ত হইয়াছে: আত্মা সর্ব্বসময়েই একরূপ ও সর্ব্বপ্রকার স্পন্দনের অতীত অর্থাৎ নিশ্চল। ইনি মন অপেক্ষাও অধিক বেগবান্। ইন্দ্রিয়াদি সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না। সেই আত্মা নিশ্চল হইলেও অতি দ্রুতগামী মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন।[১] এই আত্মাই যাবতীয় চিত্তবৃত্তি ইন্দ্রিয়-শক্তি এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের মূল কারণ।

আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, সমগ্র জগৎটী জড় ও প্রকৃতির শক্তির সমবায়ে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জড় জগৎ কতকগুলি পদার্থের স্পন্দন ব্যতীত আর কিছুই

১। অনেজদেকং মনসো জবীয়ো, নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ, তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪
—ঈশোপনিষৎ. ৪

নয়। এই পদার্থগুলির প্রকৃতি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এই বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুর কম্পন বা স্পন্দন নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে। যাহা হউক আমাদের নিকট উত্তাপ, আলোক, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, রস বা ইন্দ্রিয়ানুভূতির যোগ্য কোনও বিষয় বলিয়া পরিচিত তাহা সেই অজ্ঞাত পদার্থের স্পন্দনাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্যার উইলিয়ম্ ক্রুক্স্ বলেন: "এক সেকেণ্ডে বত্রিশটি বায়ুর কম্পন হইতে শব্দ প্রথম কর্ণগোচর হয় এবং যখন এই কম্পনের হার প্রতি সেকেণ্ডে তেত্রিশ হাজারের কিছু কম হয় কখন আর শব্দ কর্ণগোচর হয় না। উত্তাপ ও আলোকরশ্মির কম্পন এত দ্রুত হয় যে, উহা প্রায় ধারণার মধ্যেই আসে না। পনেরটী রাশির দ্বারা তাহাদের কম্পনের হার (প্রতি সেকেণ্ডে) নিরূপিত হয়। আবার সম্প্রতি 'রেডিয়ম্' (radium) নামক একটি মৌলিক ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহার কম্পনের সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে নব্বই লক্ষের দশ লক্ষ গুণের দশ লক্ষ লক্ষ (nine millions of millions of millions) অপেক্ষাও অধিক ধার্য্য হইয়াছে।" সমস্ত জগৎটাই পরমাণুর কম্পনবিশেষ। কিন্তু এই কম্পন-রাজ্যের বাহিরে এবং প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও বোধির মূলে সেই একই পরমসত্য বা আত্মা বিরাজ করিতেছেন। এই

আত্মচৈতন্যের সাহায্যেই আমরা কম্পন বা স্পন্দনের অস্তিত্ব জানিতে পারি।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই জগৎ যে স্পন্দনরাশি ভিন্ন কিছুই নহে, তাহা কে জানিতে পারিল? স্পন্দন কি আপনাকেই আপনি জানিতে পারিল? না, তাহা হইতেই পারে না। গতি হইতে গতিই উৎপন্ন হয়, গতি ভিন্ন অন্য আর কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না এবং ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতির এই চিরন্তন নিয়ম আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও সমর্থন করেন। সুতরাং গতি হইতে গতি ভিন্ন জ্ঞান কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না; গতি বা স্পন্দনের ফলও জ্ঞান নহে; জ্ঞান স্পন্দন ব্যতীত অন্য পদার্থ। ইহা আমাদের বুদ্ধিকে আলোকিত করিয়া গতি বা স্পন্দনের অস্তিত্বকেই জানাইয়া দেয়।

ঈশোপনিষৎ বলে: "অনেজদেকং," অর্থাৎ যাহা স্পন্দন-রহিত তাহাই আত্মা। নিজের অভ্যন্তরে অনুসন্ধান কর এবং দেখ কোথায় সেই স্পন্দনের ও কার্য্যের জ্ঞাতা অথচ স্বয়ং স্পন্দনরহিত বস্তু রহিয়াছেন। এই বস্তু মন অপেক্ষাও বেগবান্: "মনসো জবীয়ো"। আমরা জানি যে, জগতের মধ্যে মনই সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী। আমাদের চিন্তাশক্তি বিদ্যুৎ অথবা অন্য কোন পার্থিব শক্তি অপেক্ষাও দ্রুতগামী। স্যার উইলিয়ম

ক্রুক্স বলেন: "মস্তিষ্ক হইতে চিন্তার কম্পনগুলি যে কেন্দ্র হইতে বাহির হয় সেই স্থানে ঐ কম্পনের কোনও প্রকার সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে; কারণ উহা অতি সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের দ্বারা উৎপন্ন হয়।" তিনি আরও বলেন: "যদি আমরা এমন কোনও শক্তির ধারণা করিতে পারি যে, ঐ শক্তি প্রতি সেকেণ্ডে ইংরাজী সংখ্যা হিসাবে সহস্র সহস্র ট্রিলিয়ন বার[১] স্পন্দন উৎপন্ন করিতে পারে এবং ইহার উপর আমরা যদি আরও এই ধারণা করি যে, এই কম্পনগুলির বেগ তাহাদের গতির ক্ষিপ্রতার সহিত সমানভাবে চলে তাহা হইলে এইটি চিন্তাপ্রবাহ সময়ের অতি ক্ষুদ্রতম অংশের মধ্যেই পৃথিবীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আসিতে পারে।"

আমরা এখান হইতে ইংল্যাণ্ড কিংবা পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের সহিত বেতারবার্ত্তা অবলম্বনে অল্প সময়ের মধ্যেই সংবাদ আদান-প্রদান করিতে পারি; কিন্তু এই বেতারবার্ত্তার গতি অপেক্ষা চিন্তাপ্রবাহের গতি কিন্তু আরও দ্রুত। এইস্থানে উপবিষ্ট যে কোন ব্যক্তির মন বরাবর সূর্য্য বা সূর্য্যমণ্ডল ছড়াইয়া যেখানে বিদ্যুৎ-প্রবাহ যাইতে পারে না এইরূপ অসীমের দেশে যাইতে

১। একের ডাইনে ১২টী শূন্য বসাইলে যে সংখ্যা হয় তাহাকে ট্রিলিয়ন (trillion) বলে।

পারে এবং এই কার্য্য একটি পলকের মধ্যেই নিষ্পন্ন হইতে পারে। 'সময়' বা 'কাল' বস্তুটি মনের মধ্যেই বর্ত্তমান। 'সময়' বা 'কাল' বলিতে চিন্তাধারার ক্রমকেই বুঝায়। একটি চিন্তার পর আর একটি চিন্তার উদয় হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় চিন্তার অবকাশকেই 'সময়' বা 'কাল' বলে। সুতরাং সময় বা কাল মনোরাজ্যেরই অধীন। এই মন অপেক্ষাও যাহা দ্রুতগামী তাহাই প্রকৃত আত্মা। আমাদের চিন্তাপ্রবাহ অপেক্ষাও আত্মা দ্রুতগতিশীল। মন অর্থাৎ চিন্তাধারা যেখানে যাইতে পারে না, আত্মা সেখানেও যাইতে পারেন ; আত্মা সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত। এই মনের পশ্চাতেই আত্মা অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং মনের সমস্ত ক্রিয়াশক্তি অপেক্ষা আত্মার গতি ক্ষিপ্রতর ও দ্রুততর। জ্ঞাতারূপ আত্মার সাহায্য ব্যতীত মন কোথাও যাইতে পারে না। আত্মার সহিত বিচ্ছিন্ন হইলেই মন একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। "নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ ;" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না, কেননা আত্মা অতীন্দ্রিয় বস্তু আর সেজন্য ইন্দ্রিয়সমূহকে অতিক্রম করিয়াই তিনি বিরাজ করেন। ইন্দ্রিয়গণ আত্মার রহস্য ভেদ করিতে পারে না বা উহাদের শক্তিসমূহ আত্মার প্রকৃত স্বরূপকে প্রকাশ করিতে অক্ষম ; কারণ উহারা দেশ ও কালের দ্বারা আবদ্ধ।

সেজন্য দেশ ও কালের যিনি জ্ঞাতা তিনিই প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়রাজ্যের বাহিরে অবস্থান করেন। যেমন, যখন অমরা সূর্য্যকে দেখি তখন ঐ দৃষ্টি আমাদের 'অহং'-জ্ঞানের বা আত্মচৈতন্যের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ কিছু দেখিতে হইলে 'আমরা কিছু দেখিতেছি' এই ব্যাপারটি আমাদের মনে প্রথমে জাগরূক হওয়া প্রয়োজন। আবার এই জ্ঞান হওয়াও আত্মার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও বোধির মূলকারণ আত্মা, এই আত্মা হইতে মন ও চক্ষু বিচ্ছিন্ন হইলে আবার সূর্য্যকে দেখা যাইবে না। ঐ জ্ঞান ও চৈতন্যের কারণ যে আত্মা তাহারই শক্তিতে আমাদের মন ক্রিয়াশীল হয়, ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করে এবং দেহ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকে। সেজন্য ঈশোপনিষদে আমরা দেখিঃ "আত্মা সচলও বটে, আবার নিশ্চলও বটে; অতি দূরবর্ত্তী হইয়াও অত্যন্ত সন্নিকটে আছেন। তিনি নিখিল জগতের অন্তরে ও বহির্ভাগে বিদ্যমান্ আছেন।"[১] যখন দেহ একস্থান হইতে অন্যস্থানে বিচরণ করে, তখন আমাদের চৈতন্যরূপ আত্মাকে চলনশীল বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি নিশ্চলই, কারণ আত্মা যাইবেনই বা কোথায়? আত্মা

১। "তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥"—ঈশোপনিষৎ ১।৫

কোথাও তো যাইতে পারেন না? যখন আমরা একটি ঘটকে এক স্থান হইতে অপর স্থানে লইয়া যাই তখন ঘটের অভ্যন্তরস্থ আকাশ বা দেশকে সচল বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক ঐ ঘটাকাশ কি চলিতেছে? না, তাহা সম্ভব? তাহা হইলে যে বস্তুটি স্থানান্তরিত হইতেছে তাহা কি? আমরা বলিব তাহা আমরা জানি না। ঘটের আকৃতিটি স্থানান্তরিত হইতেছে বলিয়াই অনুমিত হইবে, কিন্তু সেই আকৃতিটিও আবার সীমাবদ্ধ আকাশ বা দেশ ব্যতীত তো আর কিছুই নহে? সুতরাং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যদি আকাশ বা দেশ অচল হয় তবে কোন আকৃতিবিশেষেরও গতি হইতে পারে না। সুতরাং ইহা প্রহেলিকা বা রহস্যপূর্ণ বলিয়াই মনে হয় এবং যখনই আমরা ইহার উত্তর দিতে চেষ্টা করি তখনই প্রতি পদে সমস্যা আরও জটিল হইয়া পড়ে।

সমগ্র মনুষ্য-জীবনটিই একটি রহস্য। আমরা প্রকৃতির অবস্থা আলোচনা করিয়া এই রহস্যের উদ্‌ঘাটন করিবার চেষ্টা করি; কিন্তু তাহাতে আমরা আরও বিভ্রান্ত হই। বিজ্ঞানও আমাদিগকে এদিকে কোনপ্রকারে সাহায্য করে না। বিজ্ঞানের পথে কিছু অগ্রসর হইয়াই বরং আমরা পথহারা হইয়া পড়ি। তখন কি করিতে হইবে, বা কোথায় যাইতে হইবে, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না।

বাস্তবিক আমাদিগের আপেক্ষিক জ্ঞানের এইরূপই দশা হয়। জীবনের রহস্যটিকে যথার্থরূপে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহা ব্রহ্মজ্ঞানেরই আংশিক বিকাশ মাত্র। ঐ জ্ঞান প্রকৃত আত্মারই যথার্থ স্বরূপ।

যাহা হউক আপেক্ষিক বা জাগতিক জ্ঞানের দ্বারা এই বিশ্বজগতের রহস্য ভেদ করিতে পারা যায় না। জগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ সেই সত্যবস্তুকে জানিতে বা উপলব্ধি করিতে হইলে বাহ্য প্রকৃতির রাজ্য ছাড়াইয়া আমাদের অনন্ত জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া রহস্যোদ্ঘাটন করিতে হইবে। এই প্রকৃতিকেই সংস্কৃত ভাষায় 'মায়া' বলা হয়। এই মায়ার জন্যই আমাদের যত ভ্রম হয়, অথচ এই মায়ার রাজ্যেই আমাদিগকে বাস করিতে হয় এবং আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন ঐ মায়া বা প্রকৃতিরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। বাহ্য প্রকৃতিতে যতই আমরা আকৃষ্ট হইয়া পড়িব ততই আমাদের ভ্রম হইবে এবং সেজন্য আমরা সত্যকার মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিব না। বৈজ্ঞানিকগণ কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বটে, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তগুলির দ্বারা আসল সমস্যার কোনই মীমাংসা করা হয় নাই। বিজ্ঞানের মতে প্রত্যেক বস্তুর চরম গন্তব্যস্থান অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। বেদান্ত এখানে বলেন যে, কেবল বহিঃপ্রকৃতির আলোচনা না করিয়া আত্মার

সম্বন্ধে আলোচনা কর, তাহা হইলেই সমস্ত অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইবে এবং পরমসত্যকে লাভ করিতে পারিবে। আমাদের দেহ যখন গতিশীল হয় তখন মায়ার আবেশে আমাদের মনে হয় যে, আত্মাও গতিশীল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আত্মা কূটস্থ ও স্থির। আবার 'মায়া' দ্বারা ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের আত্মা বহুদূরে অবস্থিত, কিন্তু বস্তুতঃ আমাদের কাছে যাহা কিছু আছে তাহাদের অপেক্ষা আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে। আমাদের শরীর ও মন সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আত্মা উহাদের অপেক্ষাও নিকটতর। এক কথায় আত্মা বিশ্বের সর্ব্ববস্তুর অপেক্ষাও আমাদের সমীপবর্ত্তী। ঈশোপনিষদেও আছে: "তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ"[১] অর্থাৎ এই আত্মা প্রত্যেক বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত আছেন। কিন্তু উহা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? যদি আত্মা কোন বস্তুর অন্তরে থাকেন তাহা হইলে আবার সেই বস্তুর বাহিরে তাঁহার থাকা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? কিন্তু ইহা হওয়া সম্ভব; কারণ আমরা দেখি যে, দেশ বা আকাশ সকল জিনিসের ভিতরে ও বাহিরে উভয় দিকেই বর্ত্তমান থাকিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপে ধরুন, যেমন একটি ঘর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। দেশ বা

১। ঈশোপনিষৎ, ১।৫

আকাশ-বস্তুটি ঘরের মধ্যেও আছে আবার বাহিরেও আছে। কিন্তু তাহা হইলে প্রাচীরগুলি কি? উহারা কি দেশ বা আকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন বা বিভিন্ন? উত্তরে বলিতে হইবে, না, প্রাচীরগুলি সীমাবদ্ধ আকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে; আকাশের সাহায্যেই উহারা বিদ্যমান আছে; সুতরাং ঐ প্রাচীরগুলিকেও আকাশই বলিতে হইবে। প্রাচীরে স্থিত আকাশখণ্ড ঘরের মধ্যস্থিত আকাশটিকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক কি প্রাচীর ঐরূপে আকাশকে আবদ্ধ রাখিতে পারিয়াছে? উত্তরে বলিতে হয়—না; কারণ গৃহমধ্যস্থ দেশ বা আকাশ বাহিরেও ব্যাপ্ত আছে। আমরা কি এই অনন্ত আকাশকে সীমাবদ্ধ করিতে পারি? না, পারি না। এইরূপে মনের দ্বারাও আমাদের আত্মাকে সীমাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে আমরা অকৃতকার্য্যই হইব, কারণ মন এত বড় নহে বা এত শক্তিশালী নহে যে, উহা সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে। ইন্দ্রিয়ের শক্তিসমূহও এই আত্মাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া পাঞ্চভৌতিক আকারবিশিষ্ট কোন পদার্থের দ্বারাই আত্মাকে ভাগ করা যায় না; কারণ ইহারা প্রত্যেকেই আত্মার সত্তাতেই সত্ত্বাবান। অতএব এই আত্মাকে যখনই আমরা যথাযথ-ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব তখনই ইঁহাকে অসীম ও

অনন্ত বলিয়া বোধ হইবে। আমরা বলিয়া থাকি যে, আমরা সসীম জীব, কিন্তু বাস্তবিক আমরা তাহা নহি। একই অসীম ও অনন্ত সত্ত্বা বিচিত্র সান্ত ও সসীম আকারের মধ্য দিয়া প্রকাশমান হইতেছেন। এই সসীম আকারগুলি আবার দেশ বা আকাশেই অবস্থান করিয়া থাকে; আকাশের বাহিরে ইহারা অবস্থান করিতে পারে না। সেরূপ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন বা ব্যষ্টি জীব সেই অনন্ত আকাশসদৃশ নির্ব্বিশেষ আত্মার মহান্ সত্ত্বাতেই বিরাজিত আছে।

উপনিষদে আছে: "যে ব্যক্তি আত্মাতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন এবং সর্ব্বভূতে আত্মাকে দর্শন করেন তিনি কাহারও প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন না।"[১] অর্থাৎ যিনি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকে আত্মা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করেন, যিনি সর্ব্বত্র সকল পদার্থেই চিরপবিত্র আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহার নিকট আর কিছুই উপেক্ষণীয় বস্তু থাকে না। অসম্পূর্ণ আপেক্ষিক জ্ঞান হইতেই ঘৃণার উদ্ভব হয় এবং আপেক্ষিক জ্ঞানই আমাদিগকে এক বস্তুকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক বলিয়া বুঝাইয়া দেয়। কিন্তু যখন আমরা অপরের মধ্যে আমাদেরই আত্মার

১। "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥"

—ঈশোপনিষৎ ৬

অস্তিত্বকে উপলব্ধি করিতে পারিব তখন আর কিরূপে অপরকে ঘৃণা করিতে পারি? আত্মা আত্মাকে ঘৃণা করিবে ইহা কি সম্ভবপর? আমাদের নিজের আত্মাকে বা নিজেকে ঘৃণা করা যেরূপ অসম্ভব, অপরের আত্মাকে বা অপরকে ঘৃণা করাও সেইরূপ অসম্ভব। আত্মজ্ঞান-জনিত বিভিন্ন ফলের মধ্যে এই ঘৃণা না করাও একটি ফলস্বরূপ। আত্মজ্ঞানের অবস্থায় ঘৃণার ভাব একেবারেই থাকিতে পারে না; আর ঘৃণার ভাব চলিয়া গেলে হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি স্বার্থজনিত কুপ্রবৃত্তিগুলিও সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া যাইবে। সুতরাং তখন অবশিষ্ট থাকিবে কি? আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে ঘৃণার প্রতিদ্বন্দ্বিস্বরূপ স্বার্থজড়িত মানবীয় ভালবাসাও অন্তর্হিত হইবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে আত্মজ্ঞানীর হৃদয়ে নিঃস্বার্থ ভগবৎপ্রেম ও সর্ব্বজীবে ভালবাসাই স্ফুরিত হইবে। যথার্থ প্রেম একত্বভাবের প্রকাশক। যেমন দেহের উপর ভালবাসার জন্য আমরা দেহকে আত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করি তেমনি পরমাত্মার উপর ভালবাসার জন্য আমরা নিজেকে পরমাত্মার সহিতই অভিন্ন বোধ করিয়া থাকি। যদি সেই পরমাত্মাকে আমরা অপরের মধ্যেও দর্শন করি তাহা হইলে তাহাকেও নিজের আত্মার ন্যায়ই না ভালবাসিয়া থাকিতে পারিব না। এইরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করিলে

আমরা 'তোমাকে তুমি যেরূপ ভালবাস, তোমার প্রতিবেশীকেও সেরূপ ভালবাসিও'—যীশুখৃষ্টের এই পবিত্র বাণী বা উপদেশের অর্থ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। যীশুখৃষ্টের এই উপদেশ যে একেবারে অনন্যসাধারণ তাহাও নহে। বেদান্ত অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই শিক্ষা আমাদের দিয়া আসিয়াছে। তবে ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী খৃষ্টানগণ নাকি বলেন যে, যীশুখৃষ্টই কেবল এই শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা জানেন না—ঐ সত্যই বেদান্তের মূল নীতি এবং ভিত্তিস্বরূপ।

কায়, মন ও বাক্যে একত্বভাব প্রকাশের নামই 'প্রেম'। উপনিষদে আছে: "যে সময় সর্ব্বভূতই আত্মার সঙ্গে এক হইয়া যায় অর্থাৎ আত্মার সহিত সকল ভূতকে যখন অভিন্ন বলিয়া বোধ করা যায় তখন সেই একত্বদর্শী জ্ঞানীর পক্ষে মোহই বা কি, শোকই বা কি? অর্থাৎ তাঁহার শোক ও মোহ কিছুই থাকে না।[১]

আত্মজ্ঞান লাভ হইলে সর্ব্বভূতের সহিত একত্বানুভূতির উদয় হইয়া থাকে। যখন সর্ব্বভূতকেই এক মহান্ বিশ্বাত্মার অংশবিশেষ বলিয়া বোধ হয় তখন আর কোন

"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥"

—ঈশোপনিষৎ ৭

ভয়ও থাকে না বা শোকও থাকিতে পারে না ; কারণ আত্মা ব্যতিরেকে তখন এমন কোনও পদার্থই আর অবশিষ্ট থাকে না যাহার জন্য শোক করিতে হইবে বা দুঃখভোগ করিতে হইবে। যতক্ষণ দ্বৈতজ্ঞান বা বহুত্বজ্ঞান থাকে ততক্ষণই শোক, দুঃখ ও ভয় ইত্যাদির উদয় হয়। যদি ভয় বা দুঃখোৎপাদক বিষয়গুলি সেই সর্ব্বানুস্যূত পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যায় তাহা হইলে শোক ও ভয় কিছুই থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ 'আত্মার বাহিরে অন্য কোন বস্তু বা বিষয় আছে' এই জ্ঞান আমাদের থাকিবে ততক্ষণ শোক, দুঃখ বা ভয়ের কবল হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারিব না সুতরাং এক ও অদ্বিতীয় আত্মার জ্ঞান লাভ হইলে শোক, দুঃখ, ভয়, মোহ ও বিচ্ছেদ সমস্তই চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং ইহাই আত্মাজ্ঞানের অন্যতম ফল।

কেহ কেহ মনে করেন যে, বেদান্ত আমাদিগকে স্বার্থপর হইতে শিক্ষা দেয় ; কিন্তু ইহা ঠিক নয়। বেদান্তের মতে আত্মানুভূতি লাভ হইলে আমাদের ক্ষুদ্র 'অহং'-জ্ঞানটির বিনাশ হয় এবং এই ক্ষুদ্র 'অহং' বা দেহাত্ম-বুদ্ধির লোপের সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারপ্রসূত স্বার্থপরতাও দূরীভূত হইয়া যায়। 'বিরাট অহং' বা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই আমার, এই বোধ এবং 'ক্ষুদ্র অহং' বা দেহাত্মবোধ, এই দুইটির অর্থ বাস্তবিক এক

নহে। 'বিরাট অহং' বলিলে আমরা প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাকেই বুঝি এবং ঐ পরমাত্মাই আমাদের যথার্থ স্বরূপ। সুতরাং আমাদের আত্মার যথার্থ স্বরূপ ঐশী শক্তিতেই পরিপূর্ণ। অতএব 'আত্মা' এই সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিলে আমরা স্বরূপতঃ যাহা সেই ঐশীশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর তাঁহাকেই বুঝিয়া থাকি এবং তাহা হইলেই 'আত্মা'-র কথা বলিলে আর জীবের স্বার্থপরতার ভাব উদিত হইবে না। এই আত্মা সম্বন্ধে ঈশোপনিষৎ আরও বলিয়াছেন :

"স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মানীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥"[১]

অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীররহিত, অক্ষত, স্নায়ুকেন্দ্র অথবা মস্তিষ্ক দ্বারা অস্পৃষ্ট, নির্ম্মল নিষ্পাপ, ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্জ্জিত, কবি (ভূত-ভবিষ্যদ্বর্ত্তমানদর্শী), মনীষী (মনের প্রভু বা সর্ব্বজ্ঞ), পরিভূ (সর্ব্বোপরি বিরাজ-মান), স্বয়ম্ভু (উৎপত্তি বা হেতুরহিত, স্বয়ং প্রকাশ) সেই পরমাত্মা সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া আছেন এবং সংবৎসরাধিপতি চিরন্তন প্রজাপতিগণকে কর্ত্তব্য বিষয়-সমূহ যথাযথরূপে প্রদান করিয়াছেন।" এই পরমাত্মা

১। ঈশোপনিষৎ ৮

নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া ওতঃপ্রোতভাবে সর্ব্ববস্তুর অন্তরে ও বাহিরে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন। আমাদের মন যেখানে যাইবে আত্মাও সেইখানেই যাইবে, কারণ আত্মাকে ছাড়িয়া মন কখনই থাকিতে পারে না। বুদ্ধিকেও এই আত্মাই আলোক প্রদান করিতেছেন। এই আত্মা পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক এবং সর্ব্ব-পাপরহিত। এইখানেই কিন্তু আমরা খৃষ্টান মত হইতে বেদান্ত মতের পার্থক্য স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। খৃষ্টানগণ বলেন যে, মানবের আত্মা জন্ম হইতেই পাপী; কিন্তু বেদান্ত বলিয়া থাকে, আমাদের আত্মা সর্ব্ব-পাপবর্জ্জিত ও চিরপবিত্র। বাস্তবিক এই শিক্ষা আমরা বেদান্ত হইতেই লাভ করিয়া থাকি। তবে ইহার দ্বারা আমাদের এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, বেদান্ত তাহা হইলে মানুষকে পাপকর্ম্ম করিতেই উৎসাহ দান করিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বেদান্তই মানুষকে শিক্ষা দিতেছে যে, যে মুহূর্ত্তে আত্মজ্ঞান লাভ হইবে সেই মুহূর্ত্তেই সমস্ত অসৎ প্রবৃত্তি দূর হইয়া যাইবে এবং পাপকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া মানুষ চির-পবিত্র হইবে।

আত্মা এই মানবশরীরের মধ্যে থাকিলেও প্রকৃত-পক্ষে অশরীরী। আত্মার কোন আকার নাই অর্থাৎ

তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম এই উভয় প্রকার আকারই রহিত। জগতে যে সকল সূক্ষ্ম আকার আছে এবং এমন কি সর্ব্বোৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য দ্বারাও দৃষ্ট হয় না এই প্রকার সূক্ষ্ম আকারও আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মা সর্ব্বপ্রকার আকার বিবর্জ্জিত। কিন্তু এই আত্মাই আবার যে কোনও রূপ বা আকার ধারণ করিতে পারেন; সর্ব্বপ্রকার রূপই আবার এই আত্মাতেই বিদ্যমান।

এই আত্মা শরীরস্থ স্নায়ুকেন্দ্রের এবং মস্তিষ্কের যাবতীয় ক্রিয়ারও বহিঃপ্রদেশে অধিষ্ঠিত। জড়বাদীরা বলেন যে, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুরাজ্যস্থ শক্তিকেন্দ্রসমূহের স্পন্দনের ফলে 'অহংজ্ঞান' বা 'আত্মচৈতন্য' উৎপন্ন হয়। কিন্তু বেদান্ত সেই কথা সমর্থন করে না। বেদান্তের মতে স্নায়বিক শক্তিকেন্দ্রসমূহ বা মস্তিষ্কপ্রসূত শক্তিরাশি এই আত্মাকে স্পর্শই করিতে পারেন না। দেহের পরিবর্ত্তনে এই শাশ্বত আত্মার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। স্থূল দেহের বর্ণের বা আকৃতির বৈলক্ষণ্য বা ভাবান্তর ঘটিতে পারে, ঐ দেহ রোগগ্রস্ত হইতে পারে বা উহা বিকলাঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু ঐ রোগ বা অঙ্গহীনতা আত্মার কিছুই পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে না। সুতরাং আত্মজ্ঞান মনুষ্যকে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য বা

অপরাপর দেহাদি নিমিত্ত দুঃখ ও ব্যাধি হইতে মুক্ত করে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, ব্যাধি বা দেহজনিত কোনও দুঃখ থাকে না।[১]

"কবি" শব্দ কাব্য-রচয়িতাকে বুঝায়; কিন্তু ইহার অপর একটি অর্থ হইতেছে 'সর্ব্বদর্শী'। আত্মাই এই নিখিলবিশ্বের মহান্ "কবি" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। প্রচলিত অর্থ অনুযায়ী তিনি "কবি" এবং তাঁহার কাব্য হইতেছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। ঈশ্বরের মহিমা সুন্দররূপে বর্ণনা করিতে হইলে তাঁহাকে "কবি" এবং বিশ্বরাজ্যটিকে তাঁহার রচিত 'কাব্য' বলিলেই সম্পূর্ণ ভাবটি প্রকাশিত হয়। তাঁহাকে আবার সর্ব্বাপেক্ষা নিপুণ চিত্রশিল্পী বলিয়াও অর্থ করা হইয়াছে। সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্তকালে তাঁহার শিল্প-নৈপুণ্য আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই অসীম আকাশে যে আমরা সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি দেখি তাহা সেই অনন্ত শক্তিমান শিল্পী বিশ্বনিয়ন্তার অদৃশ্য হস্তরচিত চিত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আত্মার যথার্থ স্বরূপ কোন-কিছু ভাল মন্দের বা ধর্ম্মাধর্ম্মের উপরে অবস্থান করে না। কেহ কেহ প্রশ্ন করেন যে,

---

১। আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াও যাঁহারা পৃথিবীতে শরীর ধারণ করিয়া বাঁচিয়া আছেন তাঁহাদিগের নিকট দুঃখ, ব্যাধি প্রভৃতি উপস্থিত হইলেও ইহারা তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না।

আত্মা ভাল ও মন্দের অতীত কিরূপে হইতে পারেন ? আবার কেহ কেহ বলেন যে, আত্মা কেবলই ভাল, মন্দের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। প্রকৃতপক্ষে ভাল এবং মন্দ এই দুইটি আপেক্ষিক শব্দ ; ভাল-র অস্তিত্ব মন্দের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। আমরা একটিকে অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে রাখিতে পারি না। যদি 'মন্দ' শব্দটি জগতে না থাকে তাহা হইলে 'ভাল' শব্দটিও থাকিবে না। একটিকে সরাইয়া লইলে অপরটিও অন্তর্হিত হইবে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এবং পুণ্য ও পাপ সম্বন্ধেও এইরূপ। ইহারা পরস্পর আপেক্ষিক শব্দ মাত্র ; একটির অস্তিত্ব ভাবিলে অপরটির অস্তিত্বও ভাবিতে হয়। কিন্তু নির্ব্বিশেষ পরমাত্মা সমস্ত আপেক্ষিক রাজ্যের বাহিরে ; সুতরাং ভাল ও মন্দ, পাপ ও পুণ্য এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

উপনিষৎ বলেন যে, এই পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোন দ্রষ্টা বা অন্য কোনও জ্ঞাতা নাই। এই নিখিলবিশ্বের জ্ঞাতা আর কে হইতে পারেন ? একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ আত্মাই জ্ঞাতারূপে আছেন এবং তিনিই সমস্ত জগতের সমস্ত বস্তু জানেন। আমাদের অন্তরে জ্ঞাতারূপে বিরাজমান আত্মাই আবার সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অংশ বা প্রতীকমাত্র। জগতের অধিকাংশ লোকই কিন্তু এই পরমসত্যকে অবগত নহেন।

ধর্ম্মপ্রচারকগণও ইহা শিক্ষা দেন না। কারণ তাঁহারা নিজেরাই এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন যে, ঈশ্বর যদি সর্ব্বভূতের জ্ঞাতা হন তাহা হইলে আমাদের অন্তরস্থ জ্ঞাতা ও সেই বিরাট জ্ঞাতা পরমাত্মারই অংশমাত্র। বেদান্তও এই কথা বলে যে, প্রথমে আমাদের ব্যক্তিগত শরীরস্থ জ্ঞাতাকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই সর্ব্বজ্ঞ বিরাট পুরুষরূপী বিশ্বের জ্ঞাতাকে জানিতে পারা যাইবে।

আমাদের আত্মা কখনও জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না; তিনি সকল সময়েই বিষয়ী বা জ্ঞাতা। লোকে যে ঈশ্বরের উপাসনা করে সেই ঈশ্বরকেই সকলের অন্তর্য্যামী ও বিরাট জ্ঞাতা বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং বেদান্তের আলোকে ঈশ্বর ও আত্মা অভেদ; অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদের অন্তর হইতেও অন্তরতম; উভয়ের নিকট বা অভেদ সম্বন্ধই আমরা উপলব্ধি করি। কিন্তু খৃষ্টান প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বর মানুষের নিকট হইতে বহু দূরে অবস্থান করেন। তাঁহাকে এতদূরে স্থান দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হওয়া জীবের পক্ষে দুরাশা মাত্র। কিন্তু বেদান্ত আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকট-বর্ত্তী যাহা কিছু আছে তাহা অপেক্ষাও সন্নিকটে ঈশ্বরকে আনিয়া দিয়াছেন। যদিও এই আত্মা 'পরিভূ' বা সর্ব্বব্যাপী তথাপি তিনি প্রকৃতির বাহিরেও সর্ব্বত্র আছেন। তবে

আত্মা সর্ব্বভূতে অবস্থান করিলেও সকল ভূত ও আত্মা কিন্তু এক বস্তু নহে। জড় জগতের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা-সমূহ এই আত্মাকে বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। পরমাত্মা প্রকৃতির সকল বিকার হইতে অতীত হইলেও আবার প্রকৃতির প্রত্যেক অণু ও পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। ইনি 'স্বয়ম্ভু' অর্থাৎ ইহার কোনও কারণ নাই সুতরাং কোন কার্য্যও নাই। পরমাত্মা প্রকৃতপক্ষে কার্য্য-কারণসূত্রের সম্পূর্ণ অতীত; অর্থাৎ পরমাত্মার কার্য্য ও কারণে কোনও ভেদ নাই। তবে ইহার কোনও কারণ না থাকিলেও ইনি সকল বস্তুর কিন্তু কারণস্বরূপ। প্রকৃত কথা এই যে, পরমাত্মা কার্য্য-কারণ নিয়মের অধীন নহেন। পরমাত্মা অনাদিকাল হইতে স্বয়ম্ভু অবস্থায় বিরাজিত আছেন এবং ভবিষ্যতেও অনন্তকাল পর্য্যন্ত এইরূপই থাকিবেন। ইহার আরম্ভ ও শেষ কেহ দেখিতে পায় না, কারণ, আরম্ভ ও শেষ কালের অধীন এবং ইহাকে বিচার করিয়া অনুসন্ধান করাও মনোরাজ্যের ব্যাপার। এই বাহ্য জগতের আরম্ভ ও শেষ সম্বন্ধে আমরা অবশ্য অনুসন্ধান করিতে পারি, কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে তাহা করা চলে না; কারণ আত্মা দেশ, কাল, নিমিত্ত, চিন্তা, মনন প্রভৃতি কার্য্যের সম্পূর্ণ অতীত। সুতরাং আত্মার আদিও নাই, অন্তও নাই।

আত্মা সর্ব্বজ্ঞ। আত্মা জ্ঞানসমুদ্র বিশেষ। যাবতীয় আপেক্ষিক জ্ঞান ঐ সমুদ্রেরই আংশিক বিকাশ। সুতরাং আমরা বুঝিলাম যে, লোকে ঈশ্বরকে যে সমুদয় বিশেষণে বিশেষিত করিয়া থাকে সে সমুদয় বিশেষণ আত্মা সম্বন্ধেও বেদান্ত প্রয়োগ করিয়াছে। লোকে বলে—ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী, নিত্য ও অসীম। বেদান্তেও আত্মাকে ঐরূপ বলা হইয়াছে। পরমাত্মা আমাদিগেরও আত্মাস্বরূপ। আত্মজ্ঞান হইলেই জানা যায় যে, যেগুলি ঈশ্বরের বিশেষণ সেইগুলিই আবার আত্মারও বিশেষণ যদিও তাহারা আরোপিত। যাহারা এই পরমাত্মার উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহারা অজ্ঞানান্ধকারে বাস করে এবং তাহাদিগকে অজ্ঞানজনিত দুঃখ ও ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।” তাহাদের সর্ব্বদাই ভীত ও অসুখীই থাকিতে হয় মৃত্যুর নামেও তাহারা ভয় পায়। তাহারা এই পার্থিব জীবন-ধারণের অন্তরায়-গুলিকে এবং দেহের নাশ বা মৃত্যুকে ভয় করে। তাহারা দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ জড়দেহে এরূপ দৃঢ়ভাবে আসক্ত হইয়া থাকে যে, উহা হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা সর্ব্বদা হৃদয়ে পোষণ করিয়া নিজ জীবনকে দুঃখময় করিয়া তুলে। তাহারা ইন্দ্রিয়-সুখ এবং পার্থিব ভোগ-বিলাস ভালবাসে এবং যখনই উহাদের অভাব হয় তখনই মিয়মাণ ও হতাশ হইয়া পড়ে। তাহাদের বিবেচনায় এই পার্থিব জীবনে ঐ সমস্ত

সুখভোগ ভিন্ন অন্য কোনও উচ্চতর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। এইপ্রকার ব্যক্তিগণের জীবন নিরবচ্ছিন্ন ভয় ও অশান্তিপূর্ণই হইয়া থাকে। যাঁহারা ধনবান তাঁহাদের চিত্তে ধনসম্পত্তি নাশের ভয় থাকে এবং যাঁহাদের সুনাম ও উচ্চপদ আছে তাঁহাদেরও ঐ সকল নাশের ভয় আছে। সাধারণ লোকের জরা, রোগ ও মৃত্যুভয়জনিত দুঃখভোগ তো আছেই। বাস্তবিক এই শ্রেণীর লোক কি কখনও জগতে যথার্থ সুখ ও শান্তি ভোগ করিতে সক্ষম হইতে পারে? কখনই না। যাঁহারা ভয়মুক্ত হইয়াছেন তাঁহারাই জগতে একমাত্র সুখী। আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই ভয়কে জয় করা যায় এবং তখন হৃদয়ে অনাবিল আনন্দের প্রবাহ বহিতে থাকে।[১] সুতরাং যাহাতে এই জীবনেই আমরা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারি তাহার জন্য আমাদের সম্যক্‌রূপে যত্নবান হওয়া উচিত। আত্মজ্ঞানের আলোক আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করে ও তৎসঙ্গে অজ্ঞান জন্য ভয়, শোক, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু ও এমন কি পরাধীনতা, সর্ব্বপ্রকার বন্ধনাদি ও মোহাদি হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়া থাকে।

আমাদের 'স্বার্থপরতা' অজ্ঞান (অবিদ্যা) হইতেই প্রসূত।

১। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৯

এই অজ্ঞানই আমাদের ঐশ্বরীক ভাবকে বা আত্মাকে আবরণী শক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখে এবং বিক্ষেপশক্তি দ্বারা জড় দেহই যে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ এই 'মিথ্যাজ্ঞান জাগাইয়া দেয়।[২] এই অবিদ্যার অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা অভিভূত হইয়া আমরা আমাদের প্রকৃত আত্মস্বরূপ ভুলিয়া যাই এবং আমরা আমাদিগকে মরণশীল মানবের পুত্র বা কন্যা ইত্যাদি বলিয়া ভাবিয়া থাকি। এইপ্রকারে আমরা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ি এবং 'আমি, আমার' ইত্যাকার স্বার্থপরতার পাশে আবদ্ধ হইয়া যাই। আত্মজ্ঞান অবিদ্যা নাশ করে এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবের উদয় করে। তিনিই ধন্য যাঁহার চিত্ত অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের ভয় এবং স্বার্থপরতারূপ কৃষ্ণ-মেঘ-জাল মুক্ত হইয়া জ্ঞান-সূর্য্যের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে।

ভাবিয়া দেখুন এই জগৎটা কি? ইহা অজ্ঞানপ্রসূত ও ভীতিসমাচ্ছন্ন। আত্মজ্ঞান সর্ব্বপ্রকার সাংসারিকভাব

২। "অজ্ঞানস্যবরণবিক্ষেপনামকমস্তি শক্তিদ্বয়ম্। আবরণশক্তিস্তাবৎ * * অজ্ঞানং পরিচ্ছিন্নমপ্যাত্মানমপরিচ্ছিন্নমসংসারিণম্ অবলোকয়িতৃবুদ্ধিপিধায়কতয়াচ্ছাদয়তীব। অনয়ৈবাবরণশক্ত্যাবচ্ছিন্নস্যাত্মনঃ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বসুখদুঃখমোহাত্মকতুচ্ছসংসারভাবনাপি সংভাব্যতে যথা স্বাজ্ঞানেনাবৃতায়াং রজ্জ্বাং সর্পত্বসংভাবনা। বিক্ষেপশক্তিস্তু যথা রজ্জ্বাজ্ঞানং স্বাবৃতরজ্জৌ স্বশক্ত্যা সর্পাদিকমুদ্ভাবয়ত্যেবমজ্ঞানমপি স্বাবৃতাত্মনি বিক্ষেপশক্ত্যাকাশাদিপ্রপঞ্চমুদ্ভাবয়তি।" —বেদান্তসার

বিনষ্ট করিয়া আমাদিগকে আধ্যাত্মিক শক্তি দান করে এবং ঈশ্বর যেরূপ ভয়শূন্য আমাদিগকেও সেইরূপ ভয়শূন্য করে। ঈশ্বর কি কোনও কিছুকে ভয় করেন? না, তাহা কিরূপেই বা সম্ভবপর হইতে পারে? যে মুহূর্ত্তে আমাদের অনুভূতি হইবে যে, ঈশ্বর আমাদের অন্তরে অবস্থান করিতেছেন সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের সমস্ত ভয় অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। যখন আমরা জানিতে পারিব যে, মৃত্যু দেহের ভাবান্তর মাত্র, অর্থাৎ এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ গ্রহণ ভিন্ন মৃত্যু আর কিছুই নহে, এবং যখন ইহাও জানিব যে, আমাদের যথার্থ স্বরূপ বা আত্মা অপরিবর্ত্তনশীল তখন আর আমাদের মৃত্যুভয় কি করিয়া থাকিবে? যাহাদের আত্মজ্ঞান লাভ হয় নাই তাহারা সত্যই দুর্ভাগা। যেপর্য্যন্ত না তাহারা তাহাদের যথার্থ স্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিবে সেপর্য্যন্ত তাহাদের এই অজ্ঞানের সংসারে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে।

আত্মজ্ঞানই অনন্ত সুখের একমাত্র কারণ। ইহাই আত্ম-স্বাধীনতা ও মোক্ষের পথে লইয়া যায়। আপনি মুক্তির অন্বেষণ করিতেছেন সত্য, কিন্তু যতক্ষণ মৃত্যুভয়ের দাস অথবা সাংসারিক অবস্থানিচয়ের অধীন থাকিবেন, ততক্ষণ আপনি উহা লাভ করিতে পারিবেন না।

আপনি ঈশ্বরের অংশ—ইহা চিন্তা করুন, ধ্যান করুন এবং তাহা হইলেই সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে ও আপনি মুক্ত হইবেন। আত্মজ্ঞানের দ্বারা এই প্রকার মোক্ষ লাভ হইলে তবেই আপনার 'অহং ব্রহ্ম' বা 'সোঽহং' ভাব এবং ঈশ্বরের সহিত একত্বানুভূতির উদয় হইবে। তখনই আপনি বলিতে সক্ষম হইবেন "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি"[১] অর্থাৎ সূর্য্যের মধ্যে যে জ্যোতিঃ দেখিতেছি তাহা আমার মধ্যেও আছে এবং আমার মধ্যে যে জ্যোতিঃ প্রকাশিত তাহাই সূর্য্যের মধ্যে দেদীপ্যমান। আমিই দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রভু এবং জাগতিক বাহ্যবস্তুরও আমি প্রভু। তখনই আপনি বুঝিবেন যে, 'আমিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আলোক স্বরূপ। আমারই আলোকে শশী, সূর্য্য, নক্ষত্র ও বিদ্যুৎ প্রকাশমান। আমি আমার নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছি, নিখিল বিশ্বের যথার্থ স্বরূপ কি তাহাও আমি উপলব্ধি করিয়াছি। সুতরাং আমি সেই 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্' বিরাট পুরুষের সহিত এক এবং এই বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।'

১। ঈশোপনিষৎ ১৬

বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিত-মাবিরাবির্ময়োঽভূর্ব্বেদসা মৎসাঽণীশ্ব্র্তং মা মা হিংসী-রনেনাধীতেনাহোরাত্রাং সংবসাম্যগ্ন ইড়া নম ইড়া নম ঋষিভ্যো মন্ত্রকৃদ্‌ভ্যো মন্ত্রপতিভ্যো নমো বোঽস্তু দেবেভ্যঃ শিবা নঃ শংতমা ভব সুমৃড়ীকা সরস্বতী মা তে ব্যোম সাদৃশি। অদধ্বং মন ইষিরং চক্ষুঃ সূর্য্যো জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠো দীক্ষে মা মা হিংসীঃ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—কৌষীতক্যুপনিষৎ।

হে বাগ্‌দেবি, আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক এবং মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। তুমি মূর্ত্তিমতী জ্ঞানস্বরূপিণী-রূপে আবির্ভূর্তা। আমার নিকট হইতে তুমি শব্দরূপে দিগ্ব্যাপিনী হইয়াছ; অতএব সত্য নষ্ট করিও না। বর্ত্তমান অধ্যয়নেই যেন দিন রাত্রি একই ভাবে অবস্থান করিতে পারি। হে অগ্নি, তোমাকে সর্ব্বতোভাবে নমস্কার। মন্ত্রপ্রযোজক ঋষিগণকে সর্ব্বতোভাবে নমস্কার। মন্ত্রপতি দেবগণ, তোমাদিগকেও নমস্কার। সরস্বতী আমাদিগের প্রতি বিশুদ্ধা কল্যাণময়ী এবং সুখদায়িণী হউন। আমি যেন শূন্যময় না দেখি। সূর্য্য যেরূপ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কখনও ইহার অন্যথা হয় না সেইরূপ আমাদের মন নির্ম্মল এবং চক্ষু ইষ্টদর্শী হউক। ইহার অন্যথা করিও না। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাণ ও আত্মা

যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক যুগের সময় হইতে ভারতবর্ষে আত্মজ্ঞানের চর্চ্চা কেবল যে দার্শনিক পণ্ডিতগণের বা ঋষিদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল তাহা নহে, তৎকালীন রাজন্যবর্গও আত্মজ্ঞান লাভকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া জানিতেন। প্রাচীন ভারতে অধিকাংশ ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণ না হইয়াও আধ্যাত্মিক বিষয়ে হিন্দুদিগের আচার্য্যরূপে ছিলেন। সাধারণের একটা ধারণা আছে যে, পুরাকালে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শিক্ষা দিতেন এবং রাজ্যশাসনাদি ও যুদ্ধাদি কার্য্য ক্ষত্রিয়-গণেরই কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ কেহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেনাপতি হইয়াছিলেন এবং সংগ্রামের সময় তাঁহারা যথেষ্ট শৌর্য্য, বীর্য্য ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই কখনও দেশের রাজা বা সম্রাট্ হইতেন না। শ্রীমদ্ভগবদগীতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রসিদ্ধ

সেনাপতি হইয়াছিলেন এবং যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইঁহারাই আবার তৎকালীন ক্ষত্রিয়গণকে ধনুর্ব্বিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যাদি শিক্ষা দিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে উপনিষৎ এবং পুরাণসমূহে বর্ণিত আছে যে, ক্ষত্রিয়গণই প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতি উচ্চতর আধ্যাত্মিক বিষয়ে ব্রাহ্মণগণের আচার্য্য বা উপদেষ্টা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র এবং বুদ্ধ ইঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন। ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ-ব্যবসায়ী জাতি বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় তাঁহারা দেশ রক্ষা করিতে, রাজ্যশাসন করিতে, শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে এবং রাজ্যে শান্তি, সুবিচার ও ধর্ম্ম স্থাপন করিতে বাধ্য ছিলেন। যদিও এই সকল কার্য্য ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ছিল তথাপি তাঁহারা প্রকৃত শিক্ষাভিলাষী অনুসন্ধিৎসুগণকে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতেও অধিকারী ও সমর্থ ছিলেন।

প্রাচীনকালে হিন্দু শাসনকর্ত্তাগণ আধুনিক রাজাদিগের মত ছিলেন না। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, মানব-জীবনের একটি গূঢ় তাৎপর্য্য আছে এবং যতদিন উহা উপলব্ধি করিতে না পারা যায় ততদিন জীবনের সার্থকতা পূর্ণ হয় না। এমন কি সেই প্রাচীন যুগেও সত্যানু-সন্ধিৎসু নৃপতিগণ ভাবিতেন যে, যাহারা 'আমি কে' এবং 'আমার স্বরূপই বা কি,' এই তত্ত্বসমূহের মীমাংসা

না করিয়া জীবন যাপন করে তাহারা গভীর অন্ধকারেই পড়িয়া আছে। এই সমস্ত কারণে তাহারা ক্ষাত্রধর্ম্মবিহিত রাজ্যশাসন প্রভৃতি কর্ম্মাদি সম্পাদন করিয়াও আত্মজ্ঞান সাধনার জন্য যথেষ্ট অবসর পাইতেন।

পুরাকালে এই ভারতবর্ষে বারাণসী নগরীতে দিবোদাস নামে এক পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। বারাণসী তখন পাশ্চাত্য জগতের এথেন্স[১] নগরীর ন্যায় ভারতের সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাশিক্ষার স্থান ও ধর্ম্ম, বিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্র চর্চ্চারও কেন্দ্রস্থল ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে এই বারাণসী প্রাচ্য সভ্যতার উৎপত্তি-স্থান বলিয়া পরিগণিত। যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের সময়ও এই স্থান হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের এবং ধর্ম্মের প্রধানকেন্দ্র ও অনুশীলনক্ষেত্র ছিল। বুদ্ধদেব যদি এই বারাণসীর পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাজিত করিয়া নিজপক্ষ অবলম্বন করাইতে না পারিতেন তাহা হইলে সমগ্র ভারতে তিনি ধর্ম্মপ্রচার ও নিজ মত স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেন না।

বারাণসীরাজ দিবোদাসের প্রতর্দ্দন নামক এক শৌর্য্যবীর্য্যশালী পুত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে,

---

১ ইউরোপের অন্তর্গত গ্রীস্ দেশের রাজধানী ছিল।

তিনি দেবতাগণকেও যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন। রাজকুমার প্রতর্দ্দন অসীম সাহস ও অলোকসামান্য শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি পৃথিবীর সমস্ত প্রবল নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া দেবতাগণকে জয় করিবার মানসে পরিশেষে দেবলোকে উপস্থিত হইলেন। কৌষীতকী উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে এই অভিযানের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণের মতে বজ্রধারী ইন্দ্র বহু যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা এবং জ্ঞানার্জ্জন করিয়া দেবতাদিগের অধিপতি হইয়াছিলেন। দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন অন্যান্য দেবতা-দিগকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রকে পরাভূত করিবার জন্য আবার ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেন। তিনি কিরূপে প্রবল শত্রুগণকে ধ্বংস করিয়া দেবতাদিগকেও পরাজিত করিয়া-ছিলেন তাহা সমস্তই দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট বর্ণনা করিলেন। এইরূপ অসাধারণ বীরপুরুষকে সমাগত দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে কিরূপ অভ্যর্থনা করা কর্ত্তব্য এবং কি প্রকারেই বা সেই অতিথি সন্তুষ্ট হইবেন তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার অসীম ক্ষমতা ও বিজয়ের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বলিলেন: "আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি তোমাকে বর দিতে ইচ্ছা করি। তোমার যাহা অভিলাষ তাহা প্রার্থনা কর, আমি তাহা পূরণ করিব।"

রাজপুত্র প্রতর্দ্দন উত্তর করিলেনঃ "হে দেবরাজ, যাহা লোকের সর্ব্বপেক্ষা শ্রেয়স্কর সেইরূপ বরই আপনি বিবেচনা করিয়া আমায় প্রদান করুন।" লোকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ঈপ্সিত বস্তু কি তাহা প্রতর্দ্দন জানিতেন না, কিন্তু ইহা বুঝিয়াছিলেন যে, এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে যাহার দ্বারা সকলেই কৃত-কৃতার্থ হইতে পারে। যে সকল মায়াবিদ্ধ ব্যক্তি আপনার স্বরূপ অবগত না হইয়া অজ্ঞানান্ধকারে বাস করিতেছে তাহাদের এইরূপ কিছু প্রয়োজন যাহা দ্বারা তাহারা তাহাদের জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অবধারণ করিতে সক্ষম হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রতর্দ্দন পুনরায় বলিলেনঃ "মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা যাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া আপনি মনে করেন তাহাই আমায় দান করুন।" দেবরাজ ইন্দ্র উত্তর করিলেনঃ "উহা ঠিক নহে, তুমি তোমার অভিপ্রেত বর নিজে প্রার্থনা কর। নিজের অভিপ্রেত বস্তুকে অপরে তাহার হইয়া কি প্রকারে মনোনীত করিরা দিবে?" রাজপুত্র তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি পুনরায় বলিলেনঃ "আমি আপনার নিকট আমার নিজের জন্য বর প্রার্থনা করিতে চাহি না।" মনুষ্যের পক্ষে কি শ্রেয়স্কর বস্তু হইতে পারে তাহার ধারণা না থাকায় প্রতর্দ্দন নির্দ্দিষ্ট কোন বরই প্রার্থনা করিতে পারিলেন না; সুতরাং তিনি সমস্ত ভার ইন্দ্রের উপর অর্পণ করিলেন। তখন ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেনঃ "আমি

তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ এবং আমার প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ হইবে না; সেইজন্য আমি তোমাকে এইরূপ বর প্রদান করিব যাহা অপেক্ষা মনুষ্য-জাতির আর অন্য কোনও শুভকর ও আবশ্যকীয় বস্তু হইতে পারে না।"[১]

ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বলিলেন: "আমাকে জান। আমার স্বরূপকে বিদিত হওয়াই মানবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর—ইহা আমি মনে করি।"

দেবরাজ ইন্দ্র যে বলিলেন: "আমাকে বিদিত হও" ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, 'আমার (ইন্দ্রের) শক্তি ও আমার যশকে বিদিত হও।' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, 'আমি, আমাকে, আমার' বা 'তুমি, তোমাকে, তোমার' এই শব্দগুলির দ্বারা যাহাকে নির্দ্দেশ করা হয় তাহারই যথার্থ স্বরূপ সেই আত্মাকে বিদিত হও। যিনি এই স্বরূপকে অবগত হইতে পারিবেন, তিনি অসীম দিব্যশক্তি লাভ করিবেন। এই অবস্থায় তিনি যদি কায়িক কোনও অন্যায় কার্য্য করেন তাহা হইলে পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। যে ব্যক্তি আত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী;

১। "স হোবাচ মামেব বিজানীহ্যেতদেবাহং মনুষ্যায় হিততমং মন্যে।"—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।১

সামান্য রাজা হইতে প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটও তাঁহার নিকট কিছুই নহে। তিনি শাস্ত্রে উল্লিখিত সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণের অধিকারী হন এবং কিছুতেই তাঁহার আত্মজ্ঞানলব্ধ মহিমা ম্লান্ হয় না।

পরে ইন্দ্র পুনরায় বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের মহিমা বর্ণনা করিবার জন্য বলিলেন: "আমি সমস্ত দৈত্যগণকে যুদ্ধে জয় করিয়াছি, আমি ত্রিশীর্ষ দৈত্যকে ও ত্বষ্ট্রৃতনয় বিশ্বরূপকে নিহত করিয়াছি, যে সকল যতি মুখে বেদোচ্চারণ করে না তাহাদিগকে বন্য কুক্কুরের মুখে নিক্ষেপ করিয়াছি, স্বর্গে প্রহ্লাদের অনুবর্ত্তী অসুরদিগকে, ভুবর্লোকে (পাতালে) পুলোমবংশীয় অসুরগণকে এবং পৃথিবীতে কালখঞ্জের অধীন অসুরদের বিনাশ করিয়াছি। আমি এইরূপ অনেক নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিয়াছি কিন্তু আমার আত্মজ্ঞান আছে বলিয়া এই সমস্ত নৃশংস কার্য্য করিলেও আমার যশ, শক্তি ও প্রভাবের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই; এমন কি আমার একটি কেশেরও কোনও ক্ষতি হয় নাই। যে ব্যক্তি আমার আত্মার স্বরূপ জানেন, তিনি জীবনে যত পাপকার্য্যই করুন না কেন—এমন কে চৌর্য্য, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা অথবা বেদপাঠনিরত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে হত্যা প্রভৃতি পাপকর্ম্ম দ্বারাও তাঁহার সুকৃতের ফল বিনষ্ট হয় না; সেই ব্যক্তি কোন পাপকার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলেও তাঁহার মুখকান্তি কখনও ম্লান

হয় না”।[১] এইরূপে ইন্দ্র আত্মজ্ঞানের কি মহিমা তাহা প্রতর্দ্দনকে বর্ণনা করিলেন।

ইহা সত্য যে, এই প্রকার বর্ণনার দ্বারা ইন্দ্র ইহা বুঝাইতে চাহেন নাই যে, আত্মজ্ঞানে বলীয়ান্ হইয়া সাধকেরা এইরূপ নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক নানাবিধ পাপকর্ম্ম করিবেন, অথচ তাহাদের কোন পাপ হইবে না। কিন্তু ঐ প্রকার বর্ণনার দ্বারা দেবরাজ ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, আত্মজ্ঞানের শক্তি পৃথিবীর যাবতীয় অন্যান্য শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ আত্মজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মহাপাপীরও হৃদয়কে নির্ম্মল করে এবং মনুষ্যের অতি ভয়ানক মহাপাপও ইহা দ্বারা ধৌত হইয়া যায়। পিতামাতার হত্যাকারীর বা গুরু হত্যাকারীর পাপ যাহা কখনই ক্ষমার যোগ্য বলিয়া মনে হয় না, কেননা তাহাও আত্মজ্ঞানলব্ধ ও চিত্তশুদ্ধিকারী পবিত্র শক্তিকে মলিন করিতে পারে না।

দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে আত্মজ্ঞানের প্রশংসা করিয়া প্রতর্দ্দনকে পুনরায় বলিলেন: “আমিই জীবনীশক্তি প্রাণ এবং আমিই প্রজ্ঞাত্মা। আমাকে আয়ুঃ অর্থাৎ প্রাণিগণের জীবনের কারণ এবং অমৃতস্বরূপ জানিয়া আমার উপাসনা

১। “স যো মাং বিজানীয়ান্নাস্য কেন চ কর্ম্মণা লোকো মীয়তে।
ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়া নাস্য
পাপং চ ন চক্রুষো মুখান্নীলং বেত্তীতি।”

—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।১

কর। আয়ুই প্রাণ এবং প্রাণই আয়ুঃ এবং প্রাণই অমৃত।"[২] সংস্কৃত ভাষায় জীবনীশক্তিকে 'প্রাণ' বলে। প্রাণ এবং চৈতন্য অভিন্ন। যেখানেই প্রাণ আছে সেখানেই চৈতন্য কোন-না-কোন আকারে থাকিবেই। ইন্দ্র সেজন্য আবার বলিলেনঃ "প্রাণ ও প্রজ্ঞাকে আমারই রূপ মনে করিয়া ধ্যান কর। জীবনই প্রাণ এবং প্রাণই জীবন। জীবনই অমরত্ব এবং অমরত্বই জীবন।" এই স্থলে আমাদের বুঝিতে হইবে যে, জীবন বা প্রাণের কখনও মৃত্যু নাই। প্রাণ শাশ্বত ও অবিনাশী, ইহার কোনও পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। প্রাণকে আমরা সমষ্টি প্রাণ হইতে বর্দ্ধিত বা পরিবর্ত্তিত হইতে দেখি না।

বাহ্যজগতে স্থূলভাবে প্রকাশমান হউক অথবা না হউক, প্রাণ সূক্ষ্মভাবে সর্ব্বসময়ে একই প্রকার থাকে। ইহার স্থূলবিকাশ বিচিত্র প্রকারে হইতে পারে, কিন্তু জীবনীশক্তি বলিতে যাহা বুঝিতে পারা যায় তাহা অপরিবর্ত্তনীয় এবং সর্ব্বদা একই ভাবেই থাকে। স্থূলদেহে জীবনীশক্তি বিকাশের অভাবকেই আমরা মৃত্যু বলিয়া থাকি; কিন্তু বাস্তবিক প্রাণ বা জীবনীশক্তির যে মৃত্যু নাই ইহা অল্পসংখ্যক

২। "স হোবাচ প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা ; তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্ব। আয়ুঃ প্রাণঃ। প্রাণো বা আয়ুঃ। প্রাণ উবাচামৃতম্।"

—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।২

লোকই ধারণা করিতে পারেন। যেখানে প্রাণ আছে সেখানে মৃত্যু থাকিতে পারে না। আমরা বলিয়া থাকি যে, একটি শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং সে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—ঐ শিশুটির প্রাণ বা জীবনীশক্তি কি বর্দ্ধিত হয়? যদি জীবনীশক্তি বা প্রাণ জন্ম ও বৃদ্ধির অধীন হইত তাহা হইলে উহা পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর হইত। যাহাকে আমরা জীবনীশক্তি বা প্রাণ বলিয়া থাকি তাহার জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু কোন দিনই হইতে পারে না। আমরা শুধু স্থূল আকারেরই পরিবর্ত্তন হইতে দেখি, কিন্তু ঐ সমস্ত পরিবর্ত্তনের সহিত আমার অবিনাশী প্রাণ বা জীবনীশক্তির কোনই হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। জীবনীশক্তির বিকাশ যে সমস্ত আধারের মধ্য দিয়া হইয়া থাকে সেই আধারগুলিরই কেবল হ্রাস বা বৃদ্ধিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যেমন আমরা বলি যে, একটি শিশু বা একটি চারাগাছ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে। এক্ষণে দেখা যায়, যাহা কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহা উহাদের কেবল স্থূল আকারের মধ্যেই ঘটিতেছে; উহাদের যে জীবনীশক্তি বা প্রাণ তাহা সদাসর্ব্বদা কিন্তু সমভাবেই বর্ত্তমান আছে। প্রাণ অন্যান্য ভৌতিক শক্তির বিকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় প্রাণীজগতের

বা উদ্ভিদ-জগতের ক্রমবিকাশ বা ক্রমবর্দ্ধনের বিচিত্র অবস্থার ভিতর দিয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে মাত্র।

"যাহা 'প্রাণ' তাহাই 'জীবন' এবং যাহা 'জীবন' তাহাই 'অমরত্ব'। যতক্ষণ দেহের মধ্যে প্রাণ আছে ততক্ষণ উহার জীবনও আছে। এই প্রাণের সাহায্যেই স্বর্গাদি লোকে গতি হইয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারা যায় বলিয়া প্রাণই 'অমৃত'।[১]

যদি আমরা প্রাণের বা জীবনের যথার্থ স্বরূপকে জানিতে পারি এবং যদি প্রাণের সহিত জীবন অবিচ্ছিন্নরূপে সংশ্লিষ্ট এই ভাবটিও অনুভব করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের যে মৃত্যু নাই, আমরা অবিনাশী ইহা নিশ্চয়ই অনুভূত হইবে। কারণ, প্রাণ বা জীবনের মৃত্যু হইতে পারে না এবং প্রাণহীন কোন জড় পদার্থ হইতে প্রাণ কখনও উৎপন্ন হয় নাই। যদি আমরা আমাদের প্রাণের উৎপত্তি কোথায় তাহা কল্পনা করিতেও চেষ্টা করি তাহা হইলে প্রাণ কোনও প্রাণহীন (অচেতন) পদার্থ বা মৃত পদার্থ হইতে আসিয়াছে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে কখনও পারিব না। যদি প্রাণের উৎপত্তিই স্বীকার করিতে হয়, তবে বলিতে

১। "যাবৎ হি অস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি তাবদায়ুঃ। প্রাণেন হ্যেবামুষ্মিঁল্লোকেঽমৃতত্বমাপ্নোতি।"—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।২

হইবে যে, প্রাণ উৎপন্ন হয় প্রাণ হইতেই। এই প্রাণ সেই অনাদিকাল হইতেই আছে এবং ইহার যে কখনও মৃত্যু বা ধ্বংস হইতে পারে তাহা আমরা ধারণা কিম্বা কল্পনাই করিতে পারি না ; সুতরাং প্রাণ নিত্য পদার্থ। এই প্রাণ যখনই কোনও স্থূলদেহের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয় তখনই দেহটিকে জীবিত বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাকেই প্রাণশক্তির গৌণ বিকাশ বলিতে হয়। এখানে আমরা জীবনীশক্তির বা প্রাণের বিষয় ভাবি না, কিন্তু প্রাণের সাহায্যে যে দেহটি গতিশীল ও কার্য্যক্ষম তাহারই বিষয় ভাবিয়া থাকি। যখন আমরা দেখি যে, কোনও একটি জীব বা প্রাণী কার্য্য করিতেছে তখন আমরা কারণরূপী প্রাণশক্তির কথা ভুলিয়া গিয়া উক্ত জীব বা প্রাণীর কথাই মাত্র মনে করিয়া থাকি ; যেমন বলি 'অমুক ব্যক্তি এতদিন জীবিত ছিলেন বা অমুক ব্যক্তি ষাট অথবা আশী বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন।' এই সমস্ত উক্তির দ্বারা আমরা আয়ুঃ বা প্রাণের গৌণ বিকাশমাত্রেরই বাস্তবিক উল্লেখ করিয়া থাকি ; মুখ্যভাবে কিন্তু প্রাণ সমস্ত গতির অতীত ও অমর অর্থাৎ মৃত্যুহীন। যখন কোন শরীরে এই প্রাণের বা জীবনীশক্তির অভিব্যক্তি হয় তখনই শরীরের অংশগুলি ক্রিয়াশীল হয়, সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয় সকল নিজ নিজ কার্য্য করে, মন চিন্তা করে এবং বুদ্ধিও কার্য্যকরী হয়।

আবার এই প্রাণ 'প্রজ্ঞা' হইতে অবিচ্ছেদ্য। যে শক্তি এই বিশ্বজগতের সমস্ত বস্তুকে গতিশীল করে সেই শক্তিকে আমরা 'প্রজ্ঞা' হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। আত্মার মধ্যে দুইপ্রকার শক্তি নিহিত আছে, একটি চিৎ-শক্তি বা প্রজ্ঞারূপে প্রকাশ পায় এবং অপরটি জীবনীশক্তি বা প্রাণের ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পায়। যাহা দ্বারা কোনও বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় তাহাই 'প্রজ্ঞা'। ইহা চৈতন্যস্বরূপ। ইহাকে 'বিষয়জ্ঞান' বলা যাইতে পারে না, কারণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলির জ্ঞান কেবল বুদ্ধির ক্রিয়া মাত্র; কিন্তু এই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান যাহা দ্বারা উদ্ভুত হয় তাহাকেই 'প্রজ্ঞা' বলে। "প্রজ্ঞয়া সত্যং সঙ্কল্পং," এই প্রজ্ঞা বা জ্ঞানশক্তি দ্বারাই অভিলষিত সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তাহার পর দেবরাজ ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বলিতে লাগিলেন: "যে ব্যক্তি আমাকে অবিনশ্বর, ধ্বংসাতীত এবং অপরিবর্ত্তনশীল প্রাণ ও প্রজ্ঞারূপে জানে সেই ব্যক্তি দীর্ঘকাল এই পৃথিবীতে বাস করিয়া মৃত্যুর পরে স্বর্গধামে গমন করে এবং সেখানে অনন্ত ও শাশ্বত জীবন উপভোগ করে।"[১] এখানে ইন্দ্র জীবনীশক্তির পরিবর্ত্তে 'প্রাণ' শব্দটি

১। "স যো ম আয়ুরমৃতমিত্যুপাস্তে সর্বমায়ুরস্মিল্লোঁক এবাপ্নোত্যমৃতত্বমক্ষিতিং স্বর্গে লোকে।"—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।২

ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া রাজপুত্র প্রতর্দ্দন ভাবিলেন ইন্দ্র বোধ হয় ইন্দ্রিয়শক্তি অর্থাৎ 'প্রাণ' শব্দটি উল্লেখ করিতেছেন ; কারণ 'প্রাণ' শব্দটি দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, মলমূত্রাদিত্যাগের শক্তি, প্রজননশক্তি, আস্বাদন-শক্তি, স্পর্শশক্তি, বাক্‌শক্তি, ধারণাশক্তি এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যাবতীয় শক্তি বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেইজন্য ইন্দ্র বলিলেন : "কেহ কেহ বলেন যে, সমস্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি একীভূত হইয়া যায়, কারণ তাহা না হইলে একই সময়ে কেহ দর্শন, শ্রবণ, বাক্য উচ্চারণ এবং চিন্তাও করিতে পারিবে না। সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি এক হইয়া পরে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় পৃথক্‌ভাবে তাহার শক্তির পরিচয় দেয়।"[২] বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলির কার্য্যাবলীকে ইন্দ্র প্রাণের কার্য্য বলিতেছেন মনে করিয়া রাজপুত্র জানিতে চাহিলেন যে, তিনি কোন্ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকে উদ্দেশ করিয়া তাঁহাকে উপরি উক্ত উপদেশ দিয়াছেন। অবশ্য জীবনীশক্তি বা প্রাণ যে একই তাহা রাজপুত্র সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার

২। "তদ্বৈক আহুরেকভূয়ং বৈ প্রাণা গচ্ছন্তীতি। ন হি কশ্চন শক্নুয়াৎ সকৃদ্বাচা নাম প্রজ্ঞাপয়িতুং চক্ষুষা রূপং শ্রোত্রেণ শব্দং মনসা ধ্যানমিত্যেকভূয়ং বৈ প্রাণা।"—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।২

ধারণা ছিল যে, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গণ যুগপৎ কার্য্য না করিয়া পৃথক্‌ভাবে একটির পর একটি করিয়া তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।[৩]

বাস্তবিক, দুইটি ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি কখনও একই সময়ে হয় না, ঐ দুইটি অনুভূতির অন্তরালে সামান্য অবকাশ থাকিবেই থাকিবে। কখনও কখনও আমাদের মনে হয় যে, একই সময়ে একটি শব্দ আমাদের কর্ণগোচর হইল ও একটি দৃশ্য আমাদের নয়নগোচর হইল, কিন্তু বস্তুতঃ ঐ দুইটি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য একই সময়ে সম্পন্ন হয় নাই এবং ইহার সত্যতাও যথাযথ বিশ্লেষণ বা বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে। সুতরাং বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতি কখনও একই সময়ে এবং একই সঙ্গে হইতে পারে না। ভারতবর্ষের প্রাচীন মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের অভিমতে মন ইন্দ্রিয়েরনুভূতিযোগ্য বস্তুসকলকে একটির পর একটি করিয়া গ্রহণ করে, অর্থাৎ মন একটি বস্তুতে যুক্ত হইবার পরে তবে অপর একটি বস্তুতে যুক্ত হয়। যখন একটি ইন্দ্রিয় তাহার কার্য্যে রত হয় তখন অপর ইন্দ্রিয়গুলি

৩। "এৈকেকং সর্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞাপয়ন্তি বাচং বদতীং সর্বে প্রাণা অনুবদন্তি। চক্ষুঃ পশ্যৎ সর্বে প্রাণা অনুপশ্যন্তি; শ্রোত্রং শৃন্বৎ সর্বে প্রাণা অনুশৃন্বন্তি; মনো ধ্যায়ৎ সর্বে প্রাণা অনুধ্যায়ন্তি। প্রাণং প্রাণন্তং সর্বে প্রাণা অনুপ্রাণন্তীতি।"—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।২

নিশ্চেষ্ট বা শান্তভাবে তাহাকে অনুমোদন করে। দুইটি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের মধ্যে ক্রমবিচ্ছেদ বা অবকাশ এত অল্প যে, যদিও আমরা মনোযোগ করিয়াও উহার বিষয় অবগত হইতে না পারি তথাপি ইহা সত্য যে, ইন্দ্রিয়গুলি একটির পর একটি করিয়া পৃথক্‌ভাবে তাহাদের কার্য্য করিয়া যাইতেছে। এই সমস্ত কারণে রাজপুত্র প্রতর্দ্দন বুঝিতে পারেন নাই যে, দেবরাজ ইন্দ্র প্রাণকে উদ্দেশ করিয়া কোন্ ইন্দ্রিয়শক্তির ক্রিয়ার বিষয় উল্লেখ করিতে-ছিলেন। সুতরাং ঐ জটিল প্রশ্নটি করিয়া তিনি নীরবে উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

তাহার পর ইন্দ্র বলিলেন : "ইহা সত্য বটে যে, ইন্দ্রিয়গুলি পর্য্যায়ক্রমে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যগুলি সম্পাদন করে এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই শক্তিশালী ; কিন্তু ইহাও জানিও যে, এই ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহ ব্যতীত আর একটি জীবনীশক্তি আছে যাহার তুলনায় অন্য যে কোন প্রকার ইন্দ্রিয়শক্তিই তুচ্ছ ; অর্থাৎ সকলপ্রকার শক্তি অপেক্ষা ঐ জীবনীশক্তিই শ্রেষ্ঠ।"[৪]

৪। "এবমুহৈবৈতদিতি হেন্দ্র উবাচ, অস্তীত্যেব প্রাণানাং নিঃশ্রেয়সাদানমিতি। জীবতি বাগপেতো, মুকান্হিপশ্যামো জীবতি চক্ষুরপেতোঽন্ধান্হিপশ্যামো জীবতি শ্রোত্রাপেতো বধিরান্হিপশ্যামঃ।"

—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।২

যে শক্তি আমাদের দর্শন করায় বা শ্রবণ করায় সেই শক্তি কিন্তু আমাদের জীবন ধারণ করিতে সাহায্য করে না। যেমন অন্ধ দেখিতে পায় না অথবা বধির শুনিতে পায় না, কিন্তু তথাপি তাহাদের জীবিত থাকিতে দেখা যায়। মূক (বোবা) ব্যক্তির মধ্যে বাক্‌শক্তি থাকে না কিন্তু সেই মূকও আবার বাঁচিয়া থাকে। এইরূপ যে সকল ব্যক্তির ঘ্রাণশক্তি ও আস্বাদনশক্তি বা স্পর্শশক্তি নষ্ট হইয়াছে তাহাদিগকেও জীবিত থাকিতে দেখা যায়। শিশু এবং জন্মমূঢ় ব্যক্তিগণের চিন্তা করিবার শক্তি থাকে না, কিন্তু তাহারা বাঁচিয়া থাকে।[১] আবার ইহাও দেখা যায় যে, স্মৃতিশক্তির লোপ হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তিও জীবিত থাকে। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, যে শক্তিদ্বারা আমরা জীবিত থাকি সেই শক্তি এবং দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদন, বাক্ ও চিন্তাশক্তি ঠিক এক নহে। আবার কোনও ব্যক্তি হস্তবিহীন হইয়া কিছু ধরিতে সক্ষম না হইলেও আমরা তাহাকে 'মৃত' নামে অভিহিত করিতে পারি না। এইরূপ যদি কাহারও পদ বা অন্য কোনও অঙ্গ বিকল হয় তাহা হইলে বিকলাঙ্গ হওয়ার জন্য সেই ব্যক্তির

১। "জীবতি শ্রোত্রাপেতো বধিরাম্বিপশ্যামো ;
জীবতি বাহুচ্ছিন্নো জীবতি উরুচ্ছিন্ন ইতি।
এবং হি পশ্যাম ইতি।" —কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।২

জীবনীশক্তি বা 'মুখ্যপ্রাণ' তিরোহিত হইবে না। সুতরাং এখন আমরা বলিতে পারি যে, এই জীবনীশক্তি বা 'মুখ্যপ্রাণ' ইন্দ্রিয়ের কার্য্য অথবা ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। আবার ইহাও সত্য যে, জীবনীশক্তি বিচ্যুত হইলে দেহের বহির্যন্ত্রস্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলিও কোন কার্য্য করিতে পারে না—অচল হইয়া যায়।

জীবনীশক্তি বা 'মুখ্যপ্রাণ' ইন্দ্রিয়শক্তির উপর নির্ভরশীল নহে; কিন্তু ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি জীবনীশক্তির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। যেখানে জীবনীশক্তির বহির্বিকাশ না থাকে সেখানে ইন্দ্রিয়গুলি নিখুঁৎ থাকিলেও উহাদের ক্রিয়াসমূহ এবং দর্শন ও শ্রবণাদি অনুভূতির কোনও অভিব্যক্তি দেখা যাইবে না। একটি মৃত ব্যক্তির চক্ষু অবিকৃত থাকিতে পারে, চক্ষুর সমস্ত স্নায়ুও ঠিক্ থাকিতে পারে, মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র কোষগুলিও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতে পারে কিন্তু ঐ মৃত ব্যক্তির দেহের মধ্যে জীবনীশক্তি বিলুপ্ত থাকায় ইন্দ্রিয়গুলি নিশ্চেষ্ট থাকে, তাহারা নিজ নিজ ক্রিয়া করিতে অক্ষম হয় এবং কোনপ্রকার অনুভূতি উৎপন্ন করিতেও পারে না, সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয় একেবারে প্রাণহীন অবস্থাতেই থাকে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, সমস্ত ক্রিয়ার মূল এই 'মুখ্যপ্রাণ' ইন্দ্রিয়গুলিতে বিদ্যমান থাকিলেই তবে উহারা ক্রিয়াশীল

হয়। কারণ 'মুখ্যপ্রাণ'ই ইন্দ্রিয়গুলির অধিপতি ও নিয়ামক। বেদেও দেখা যায়ঃ "নিখিল বিশ্বের জীবনদাতা সেই জীবনীশক্তি বা 'মুখ্যপ্রাণ'-কে সকলেরই উপাসনা করা উচিত।" যদি কেহ জীবনীশক্তি বা 'মুখ্যপ্রাণ' কি তাহা বুঝিতে পারেন তাহা হইলে তিনি কি উপায়ে জীবিত আছেন বা এই বিশ্বজগৎ কিরূপে সজীব আছে সেই রহস্যও তিনি ভেদ করিতে পারেন।

পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিকগণ, শরীরতত্ত্ববিদ্গণ এবং ক্রমবিকাশবাদিগণ সকলেই এই জীবনীশক্তিটি কিরূপ তাহা জানিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা কি এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন? না, তাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত এই বিষয়ে সফলকাম হন নাই। উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, ইহা আণবিক আকর্ষণশক্তি; আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইহা ভৌতিক ও রাসায়নিক শক্তির সংমিশ্রণের ফল। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহাদের মধ্যে কি কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে, তাঁহার মতটিই অভ্রান্ত সত্য? জীবনীশক্তির মূল কোথায় এই বিষয় অন্বেষণ করিতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কতদূর অগ্রসর হইয়াছে? জীবনী-শক্তি প্রকৃতিরাজ্যের জড়শক্তিসমূহ হইতে স্বতন্ত্র এই ধারণা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু জীবনী-শক্তির বা প্রাণের অনাদি উৎস কোথায় তাহা তাঁহারা স্পষ্ট

করিয়া বলিতে পারেন না। বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকগণ এই বিষয় লইয়া বহু বাদ-প্রতিবাদ এবং গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু উহা পূর্ব্বে যেমন জটিল ছিল এখনও উহাদের নিকট ঠিক্ সেই প্রকারই জটিল রহিয়া গিয়াছে, উহারা এ পর্য্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তেও উপনীত হইতে পারেন নাই। যে মুহূর্ত্তে আমরা এই সমগ্র বিশ্বের জীবনীশক্তি কি তাহা ধারণা করিতে পারিব সেই মুহূর্ত্তে সেই চৈতন্যময় ঈশ্বরেরও ধারণা আমাদের হইবে। কারণ বেদান্ত বলে যে, যিনি ঈশ্বররূপে পূজিত, তাঁহার বিরাট্ সত্ত্বা হইতে এই জীবনীশক্তি বা 'প্রাণ' অভিন্ন।

এক্ষণে প্রশ্ন, ঈশ্বর বলিতে আমরা কি বুঝি? যিনি সমস্ত বস্তুকে সচেতন রাখেন এবং যাঁহার উপর সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক যাবতীয় ক্রিয়া ও দেহধর্ম্মাদি নির্ভর করে তিনিই ঈশ্বর। দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন: "এই দেহ প্রাণের দ্বারা সজীব হওয়াতেই ক্রিয়াশীল হয়। এই প্রাণই সেই চেতনাসংযুক্ত 'অহং'। যাহা 'প্রাণ' তাঁহাই 'প্রজ্ঞা' এবং যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ; এই দুইটিই দেহের মধ্যে এক সঙ্গে থাকে এবং এক সঙ্গে চলিয়া যায়।"[১] যেখানে

১। "অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি। তস্মাদেতদেবোক্থমুপাসীত। যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ।"—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৩

জীবন নাই সেখানে কি কেহ 'প্রজ্ঞা'-র সন্ধান পাইয়াছে? উহা একেবারে অসম্ভব। যেখানে প্রজ্ঞা আছে, সেখানে নিশ্চয়ই জীবন আছে। জীবন বা প্রাণ এবং প্রজ্ঞা এই দুইটিই অবিচ্ছেদ্য।

এক্ষণে বলিতে পারা যায় যে, বৃক্ষ-লতাদিতে প্রজ্ঞার অস্তিত্ব প্রতিভাত হইতে দেখা যায় না, সুতরাং তাহাদের প্রজ্ঞা নাই। কিন্তু এই সামান্য যুক্তির দ্বারাই কি উহাদের মধ্যে 'প্রজ্ঞা' নাই তাহা স্বীকার করা সঙ্গত হইবে? মনুষ্যের ন্যায় বৃক্ষাদির মস্তিষ্ক নাই বলিয়াই কি উহাদের মধ্যে 'প্রজ্ঞা' নাই এই মত পোষণ করিতে হইবে? বাস্তবিক মস্তিষ্কযুক্ত প্রাণীদের যেরূপ প্রজ্ঞা আছে,

---

অর্থাৎ যেহেতু প্রজ্ঞাস্বরূপ প্রাণই এই প্রত্যক্ষ শরীরকে 'ইহাই আমি' অথবা 'ইহা আমার' এইরূপ জ্ঞান করিয়া আসন ও শয্যাদি হইতে উত্থাপিত করান সেইজন্য তাঁহাকেই "উক্‌থ" (উত্থাপয়িতা) বলিয়া উপাসনা করা কর্ত্তব্য। যিনি প্রাণ তিনিই প্রজ্ঞা; যিনি প্রজ্ঞা তিনিই প্রাণ, অর্থাৎ প্রাণোপাধিযুক্ত পরমাত্মা।

"স হ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ সহোৎক্রামতস্তস্যৈষৈব দৃষ্টিঃ।"
—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৩

এই প্রজ্ঞা ও প্রাণ সম্মিলিত হইয়া এই শরীরে বাস করেন এবং মিলিত হইয়াই শরীর হইতে নির্গত হন; এই প্রাণোপাধিযুক্ত পরমাত্মাকে (হিরণ্যগর্ভকে) এইরূপেই অবগত হইতে হয়।

উদ্ভিদেরও ঠিক্ সেইরূপ প্রজ্ঞা না থাকিতে পারে, কিন্তু মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তে বৃক্ষাদির মধ্যে 'প্রাণ' ও তদুপযুক্ত স্নায়ু আছে এবং তাহার জন্যই তাহাদের 'প্রজ্ঞা' বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। যে সকল উদ্ভিদ্ স্পর্শমাত্রেই আকুঞ্চিত হয়, যেমন লজ্জাবতী লতা—তাহাদের যে অনুভবশক্তি নাই তাহা কেমন করিয়া বলা যায়?[১] ঈশ্বর যে তাঁহার মহিমা প্রচারের জন্য কেবল মনুষ্যকেই জীবন দান করিয়াছেন, খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের এবম্প্রকার গোঁড়ামীপূর্ণ বাক্যসমূহ অধুনা আর আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে না। এমন কি, আর্ণেষ্ট হেকেলের ন্যায় আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও সম্যক্-রূপে এই ধারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক লতাগুল্মের মধ্যেই আত্মা আছে এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র জীবকোষের মধ্যেই প্রাণ আছে। প্রত্যেক কোষই সজীব; এমন কি প্রত্যেকটি পরমাণুর ভিতরও আত্মা আছে। আবার যেখানে আত্মা আছে সেখানে অহং-জ্ঞানের মূলস্বরূপ 'প্রজ্ঞা'-রূপ চৈতন্যও আছে। তবে কোনও ক্ষেত্রে এই প্রজ্ঞার

১। স্বর্গীয় স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় *Response in Living and Non-living* নামক পুস্তকে বহু গবেষণা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, বৃক্ষ ও লতাসমূহের, এমন কি জড় বলিয়া যে সমস্ত পদর্থকে আমরা অভিহিত করি তাহাদেরও প্রাণ, সংজ্ঞা ও অনুভূতি আছে; প্রাণহীন বস্তু বলিয়া জগতে এমন কোন পদার্থই নাই।

প্রকাশ অল্পমাত্রায় থাকে ও কোনও স্থলে বা ইহা সূক্ষ্মভাবে থাকে এবং কোথাও বা ইহা সুপ্তভাবে থাকিয়া বহিঃ-প্রকাশের উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু যাহাই হউক না কেন, ইহা নিশ্চিত যে, যেখানেই জীবন আছে সেখানেই চৈতন্যের বা প্রজ্ঞার কোন-না-কোন প্রকার অস্তিত্ব আছেই এবং যেখানেই প্রজ্ঞার প্রকাশ দেখা যায় সেইখানে প্রাণও আছে ইহা বুঝিতে হইবে।

আমরা প্রাণীজগতে দেখিয়া থাকি যে, 'প্রাণ' যখন শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায় তখন প্রজ্ঞাও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়। এইরূপ যখন কেহ নির্জীব অবস্থায় অর্থাৎ মূর্চ্ছাবস্থায় অথবা অচৈতন্যাবস্থায় থাকে তখন তাহার দেহ বা ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে জীবনীশক্তির কোনওপ্রকার বহিঃপ্রকাশের চিহ্ন থাকে না এবং এই সময়ে তাহার প্রজ্ঞাও অন্তর্হিত না হইয়া বাস্তবিক সুপ্তভাবেই থাকে।

তাহার পর দেবরাজ ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে আবার বলিলেন: "যখন কেহ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকে এবং কোনও প্রকার স্বপ্নাদি দর্শন না করে তখন তাহার মন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে এবং সেই সময় ঐ ব্যক্তি অজ্ঞানরূপ আবরণের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে।"[১] কখন কখনও আপনারা দেখিয়াছেন

১। "এতদ্বিজ্ঞানম্ যত্রৈতৎ পুরুষঃ সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি।"—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩৩

যে, স্বপ্নশূন্য গভীর নিদ্রা অর্থাৎ সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইয়া মনে হয়, যেন আমরা এক অজ্ঞানের রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু এইরূপ নিদ্রাবস্থায় আপনাদের ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াসমূহেরও দর্শন, শ্রবণ ও আঘ্রাণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তির কি অবস্থা হয় তাহা কি আপনারা জানেন? তাহারা তখন প্রাণের মধ্যে সুপ্তভাবে থাকে, অর্থাৎ তাহারা চেতন স্তর হইতে ফিরিয়া যাইয়া জীবনী-শক্তির (প্রাণের) মধ্যে তখন আশ্রয় লয়।[১] যখন জীবনীশক্তি নিষ্ক্রিয় থাকে তখন অন্যান্য শক্তিগুলিও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। গভীর নিদ্রাবস্থায় বা সুষুপ্তিতে আমরা কথাও বলি না, দর্শনও করি না বা কোনও কিছুর আঘ্রাণও পাই না। যদি আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতি নিকটে কামানের শব্দ হয় তাহাও আমরা তখন শুনিতে পাই না। আমাদের মন তখন বাস্তবিক কোন বাহ্য বিষয়ের চিন্তা বা কল্পনা করে না। সমস্ত দৈহিক ও মানসিক

অর্থাৎ সে অবস্থায় পুরুষ গাঢ় নিদ্রায় সুপ্ত হইয়া অন্য বিষয়ে জ্ঞানশূন্য হন এবং কোন স্বপ্ন দর্শন করেন না। তখন সেই পুরুষের যাবতীয় শক্তি এই প্রাণেই একত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ইহাই প্রাণবিজ্ঞান।

১। "তত্রৈনং বাক্‌ সর্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্বৈঃ রূপৈঃ সহাপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি, মনঃ সর্বৈর্ধ্যাতৈঃ সহাপ্যেতি।" —কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩,৩

শক্তিসমূহ তখন সুপ্তাবস্থায় থাকে এবং আমরা জাগরিত হইলেই উহারা যেন সেই সঙ্গে আবার বাহির হইয়া আসে। নিদ্রিতাবস্থা হইতে জাগরণের প্রথম লক্ষণ দৈহিক ক্রিয়ার দ্বারা পরিলক্ষিত হয়। স্বপ্নশূন্য নিদ্রাবস্থা বা সুষুপ্তি অবস্থায় জীবনীশক্তি দেহের কেন্দ্রস্থান হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয় না; কারণ সেই সময়ে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, রক্ত-সঞ্চালন, পরিপাককরণ, পাকস্থলীর ক্রিয়া ও শ্বাস-প্রশ্বাসাদির ব্যাপারে বুঝিতে পারা যায় যে, মনের অবচেতন স্তরে প্রাণশক্তি আমাদের অচেতন অবস্থাতেও এই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে। যে শক্তির দ্বারা হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া চলিতে থাকে সেই প্রাণ-শক্তি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইলে শরীরের আর কোন ক্রিয়াই থাকে না। এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয় হইতে প্রাণ বিচ্ছিন্ন হইলে কেহই আর জাগ্রত অবস্থায় ফিরিয়া আসে না। ইহাকেই মৃত্যু বলে। কিন্তু গভীর নিদ্রাবস্থায় অর্থাৎ সুষুপ্তিতে আমরা প্রাণের সহিত এক হইয়া যাই। তখন এই 'প্রাণ' আমাদের সচেতন দৈহিক ক্রিয়াসমূহকে আকর্ষণ করিয়া লয়, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় পুনরায় ঐগুলি নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ে ফিরিয়া আসে। তখনই ইন্দ্রিয়গুলি আবার সচেতন হয় ও আপনার কার্য্য করিতে আরম্ভ করে।

এই ব্যাপার বা তথ্যটি ভালভাবে বুঝাইবার জন্য একটি

দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া ইন্দ্র পুনরায় বলিলেন: "যখন প্রাণোপাধিক পুরুষ সুষুপ্ত অবস্থা হইতে ফিরিয়া জাগ্রত অবস্থায় উপনীত হন তখন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গসমূহ চতুর্দ্দিকে নির্গত হয় সেইরূপ এই প্রাণোপাধিক আত্মা হইতে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহ ভিন্ন ভিন্ন স্ফুলিঙ্গের মত নির্গত হইয়া নিজ নিজ স্থানে উপস্থিত হয় এবং পরে বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে আসে।"[১] যখন এইরূপ একটি প্রাণের প্রেরণা বা স্পন্দন চক্ষুকে আশ্রয় করে তখন উহা দৃশ্য বস্তুটিকে, তাহার আকারকে ও বর্ণকে উদ্ভাসিত করে। এইরূপে অপর একটি প্রাণস্পন্দন শ্রবণেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিলে শব্দের শ্রবণ হয়। ঠিক একই প্রকারে অন্যান্য ইন্দ্রিয়শক্তিসকল প্রাণরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণারূপে নির্গত হইয়া আপনাপন ইন্দ্রিয়াভিমুখে যাইতে থাকে। মনও এইরূপ একটি প্রাণেরই স্পন্দন মাত্র এবং উহার দ্বারাই মনের চিন্তা প্রভৃতি নানাবিধ মানসিক কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু "যখন কেহ রোগ, শোক, জরা প্রভৃতির বশীভূত হইয়া দুর্ব্বলতা-বশতঃ হস্তপদাদি অত্যন্ত অবশ হইয়া অজ্ঞানাবস্থায়

১। "স যদা প্রতিবুধ্যতে। যথাগ্নের্জ্বলতো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্ এবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ।"—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৩

মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি তাহাদের কেন্দ্রে (প্রাণে) প্রত্যাগত হয় ; তখন সকলে বলে যে, লোকটির মন দেহ হইতে নির্গত হইয়াছে। ঐ সময়ে সে আর দেখিতে, শুনিতে, কথা বলিতে, আত্মীয়-স্বজনকে চিনিতে বা চিন্তা করিতে পারে না। সেই ব্যক্তি সেই সময়ে প্রাণের সহিত এক হইয়া যায়।"[১] দেহ ত্যাগ করিবার সময় 'প্রাণ' ইন্দ্রিয়শক্তিগুলিকে সঙ্গে লইয়া যায়। মরণাপন্ন ব্যক্তির মহাপ্রস্থানের সময় দেহী বা জীবাত্মা উহার দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদন, ধারণ, বাক্ ও প্রজনন্ ইত্যাদি শক্তিসমূহকে ও 'অহমস্মি', 'আমি' ও 'আমার' ইত্যাকার জ্ঞানগুলিকেও সঙ্গে লইয়া চলিয়া যায়। যখন 'প্রাণ' দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায় তখন দেহযন্ত্রের চেতন, অবচেতন ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়াগুলি এবং যাবতীয় ইন্দ্রিয়শক্তিও প্রাণের সহিত একীভূত হইয়া যায়। এই সমস্ত শক্তির সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি যেমন রূপ, শব্দ ও গন্ধ ইত্যাদিও প্রত্যাহৃত হয়। যখন দর্শনশক্তিটি চলিয়া যায় তখন যন্ত্রস্বরূপ চক্ষু দ্বারা যাহা দেখা যায় তাহা অর্থাৎ 'রূপ' বা 'আকার'-ও মৃতব্যক্তির নিকট প্রতিভাত হয় না।

১। 'যত্রৈতৎ পুরুষঃ আর্ত্তো মরিষ্যন্ আবল্যং ন্যেত্য মোহং নৈতি তদাহুঃ উদক্রমীচ্চিত্তম্। ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন বাচা বদতি ন যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি।''—কৌষীক্যুপনিষৎ ৩।৩

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি এবং ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। যখন কোন ইন্দ্রিয়শক্তি প্রত্যাহৃত হয় তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়টিও উহার সহিত প্রত্যাহৃত হয়। যদি শ্রবণেন্দ্রিয় না থাকে তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার শব্দ বন্ধ হইয়া যায়; অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় প্রত্যাহৃত হইলে শব্দসমূহও প্রত্যাহৃত হয়। এক্ষণে আমরা যে সমস্ত বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকি তাহা রুদ্ধ হইলে বাক্‌শক্তি তখন কিভাবে থাকে? উহা ঐ সময়ে সুপ্তভাবে থাকে এবং ঐ বাক্‌শক্তির দ্বারা যাহা প্রকাশিত হয় সেই 'নাম'-গুলিরও অর্থাৎ বস্তুবাচক নামগুলিরও অস্তিত্ব চলিয়া যায়। ঐ একই প্রকার কারণে ঘ্রাণশক্তিটি প্রত্যাহৃত হইলে উহার সহিত গন্ধাদি আঘ্রাণরূপ ক্রিয়াও চলিয়া যায়। আবার এইরূপ মন ও বুদ্ধি যখন নিষ্ক্রিয় হইয়া যায় তখন চিন্তাশক্তি, স্মৃতি, ইচ্ছা, প্রত্যক্ষ, অনুমানযোগ্য বিষয়সমূহ ও মানসিক ভাবরাশি সমস্তই অন্তর্হিত হয়। মৃত্যুকালে দৈহিক ও মানসিক শক্তিসমূহ এইরূপ নির্ব্বিশেষভাবে আত্মা বা প্রাণে একীভূত হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই আমরা জানিয়াছি যে, 'প্রাণ' ও 'প্রজ্ঞা' এই দুইটি অবিচ্ছেদ্য; একটির অভাব হইলে সঙ্গে সঙ্গে অপরটিরও অভাব হইবে। সুতরাং 'প্রাণ' চলিয়া গেলে তৎসঙ্গে প্রজ্ঞাও চলিয়া যাইবে। যখন কাহারও এইরূপ অবস্থা ঘটে তখন বুঝিতে হইবে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

মৃত্যুর পরে ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহ প্রাণের সহিত একীভূত হইয়া জীবাত্মার সহিত থাকে এবং ঐ জীবাত্মা আবার অন্য এক শরীর ধারণ করিয়া উহাদিগকে প্রকাশ করে। গভীর নিদ্রা বা সুষুপ্তির পরে জাগরণের সময় যেমন মানসিক ও দৈহিক শক্তিসমূহ প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে সেইরূপ চিরনিদ্রা বা মৃত্যুর পরে পুনর্জন্ম গ্রহণের সময় সুপ্তশক্তিসমূহ প্রাণরূপ আধার হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া নূতন নূতন ইন্দ্রিয়সমূহ সৃজন করে এবং উহাদিগকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতে থাকে।[১]

১। "ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন বাচা বদতি ন যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি, তদৈনং বাব সর্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্বৈ রূপৈঃ সহাপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি, মনঃ সর্বৈ র্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি। যদা প্রতিবুধ্যতে যথাগ্নের্জ্বলতো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠে-রন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবভ্যো লোকাঃ।"—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৩

"স যদাহস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি সহৈ বৈতৈঃ সর্বৈরুৎক্রামতি বাগস্মাৎ সর্বাণি নামান্যভিবিসৃজতে। বাচা সর্বাণি নামান্যাপ্নোতি। …সৈষা প্রাণে সর্বাপ্তিঃ।"—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৪

"যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা বা প্রজ্ঞা সঃ প্রাণঃ। স হ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ সহোৎক্রামতঃ।"—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৪

অর্থাৎ যাহা প্রাণ তাহাই প্রজ্ঞা, যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ।

কিন্তু এই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সৃষ্টি করে সেই শক্তিটি কি? উহাই 'প্রাণ' বা জীবনীশক্তি এবং এই শক্তির মধ্যেই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বাসনা, প্রবৃত্তি ও সংস্কারসমূহ সুপ্তভাবে অবস্থান করে।

যখন ইন্দ্রিয়সমূহ নিষ্ক্রিয় থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই যখন তাহার নিজ নিজ কার্য্য করিতে বিরত থাকে তখন ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া একেবারে লুপ্ত না হইয়া সুপ্তভাবেই থাকে; সুতরাং এইরূপ অবস্থায় কোন ইন্দ্রিয় কিছুই অনুভব করে না এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সকলের আপেক্ষিক সত্বাও ঐ সময় অন্তর্হিত হয়। জ্ঞান এবং চৈতন্যের কেন্দ্র দেহী বা জীবাত্মা। এই দেহী 'প্রাণ' বা জীবনীশক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত। এই প্রাণেরই এক অংশ ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে এবং অপর অংশ গন্ধাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়। যেমন ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-গুলির কোন সম্পর্ক না থাকিলে ঐ বিষয়গুলির অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় যতক্ষণ আছে ততক্ষণ বিষয়ীও আছে।

আমরা পূর্ব্বে যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি

এই প্রাণ এবং প্রজ্ঞা মিলিত হইয়া শরীরে বাস করেন এবং মিলিত হইয়া শরীর হইতে নির্গত হন।

সেইগুলির পুনরায় আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা জানিয়াছি যে, ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহ 'প্রাণ' বা জীবনীশক্তির সম্পূর্ণ অধীন। 'প্রাণ' ও 'প্রজ্ঞা' এই দুইটি এক সঙ্গে বাস করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষসাপেক্ষ, কারণ ঐ বিষয়গুলির অস্তিত্ব উপলব্ধিকরণক্ষম শক্তিসমূহের উপরই নির্ভর করে; অর্থাৎ যাহা দ্বারা ঐ বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ হইবে সেই শক্তির অভাব হইলে ঐ বিষয়গুলির অস্তিত্ব থাকা বা না-থাকা উভয়ই সমান। যদি আমাদের দর্শনশক্তি লোপ পায় তাহা হইলে কোন প্রকার বর্ণই আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হইবে না। আমাদের শ্রবণশক্তি কার্য্যক্ষম না থাকিলে কোন প্রকার শব্দই আমরা শ্রবণ করিতে পারি না। এইরূপে প্রমাণ করিতে পারা যায় যে, প্রত্যক্ষের বিষয়গুলির সহিত সংবেদন বা জ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। প্রত্যক্ষরূপ ক্রিয়াটিও আবার ইন্দ্রিয়-শক্তির উপরে নির্ভর করে। প্রত্যক্ষের একটি বিষয়কে এক-খণ্ড বস্ত্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যেরূপ বস্ত্রখণ্ড ও বস্ত্রখণ্ডস্থিত সূত্রগুলির মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই সেরূপ প্রত্যক্ষের একটি বিষয়ের সহিত সংবেদন-ক্রিয়া ও অনুভব-শক্তিসমূহেরও কোন প্রভেদ নাই। অর্থাৎ যেমন বস্ত্রখণ্ড বলিলে বস্ত্রখণ্ডের সূত্রগুলিকেই বুঝায়, কারণ ঐ সূত্রগুলি ব্যতীত বস্ত্রের আর অন্য কোন উপাদান নাই সেরূপ

প্রত্যক্ষের বিষয় বলিলে উহা প্রত্যক্ষীকরণ ও অনুভব-শক্তির সমষ্টিকেই বুঝায়। আবার প্রত্যক্ষীকরণ ও অনুভব-শক্তিরূপ সূত্রগুলি প্রাণশক্তি হইতে আবর্ত্তিত হইয়াই যেন নির্ম্মিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই বিশ্বজগতের সত্ত্বা বা অস্তিত্ব প্রাণ ও প্রজ্ঞা ভিন্ন থাকিতে পারে না। আত্মাই বিশ্বজগতের কেন্দ্র বা অধিষ্ঠান। আত্মা আমাদের প্রত্যেকেরও কেন্দ্রস্বরূপ। আত্মা প্রাণের সহিত অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত। আত্মা হইতেই এই জীবনের এবং যাবতীয় ইন্দ্রিয়শক্তির উৎপত্তি। বস্তুতঃ এই দৃশ্যমান বাহ্যজগতের মূলই হইতেছেন একমাত্র আত্মা।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, প্রাণ বা প্রজ্ঞার সংখ্যা বহু নহে, উহা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। যে জীবনীশক্তি আপনার ভিতর আছে সেই জীবনীশক্তিই আমার এবং অপরের ভিতরেও আছে। জীবনীশক্তি যেরূপ বহু নহে কিন্তু এক, প্রজ্ঞাও সেইরূপ এক; সুতরাং আপনার মধ্যে যে প্রজ্ঞা বর্ত্তমান সেই প্রজ্ঞাই আমার এবং অপরের মধ্যেও বর্ত্তমান। এই নিখিল বিশ্বের সর্ব্বত্রই 'প্রাণ' বা 'প্রজ্ঞা' একটি ভিন্ন দুইটি নহে। অপরের প্রজ্ঞার সহিত আমাদের প্রজ্ঞার তুলনা করিয়া পরস্পরের বৈশিষ্ট্য কেবল বাহ্য লক্ষণ দ্বারাই অনুমিত হইতে পারে। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের মূলে 'প্রজ্ঞা' অবস্থিত। কোনও বাক্য উচ্চারিত হইলে ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য

প্রজ্ঞা বা 'অহমস্মি'-জ্ঞান না থাকিলে বুঝিতে পারা যায় না। এইরূপ কর্ণদ্বারা কোনও প্রকার শব্দ শ্রবণ 'প্রজ্ঞা' ভিন্ন সম্ভবপর নহে। যখন উহা কোনও বিষয়ে বিশেষ ভাবে নিবিষ্ট থাকে তখন কোনও বস্তু আমাদের চক্ষুর অতি সন্নিকটে থাকিলেও আমরা দেখিতে পাই না।[১]

এইরূপ দেখা যায় যে, যখন কেহ পথের মধ্যে কোনও একটি বস্তুবিশেষের উপর একাগ্রতা সহকারে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তখন তাহার সম্মুখ দিয়া যাহা-কিছু চলিয়া যাক্ না কেন তাহা তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না, সেরূপ কোন ব্যক্তি যদি একটি শব্দ বিশেষের উপর মনঃসংযোগ করিয়া থাকে তাহা হইলে অপরাপর শব্দ আর তাহার শ্রুতিগোচর হয় না; এমন কি সেই সময়ে যদি কেহ তাহাকে তাহার নাম উচ্চারণ করিয়াও সম্ভাষণ করে তাহা হইলেও সে তাহা শুনিতে পায় না। সেরূপ যদি কাহারও মন বিশেষ কোনও চিন্তায় বা ভাবে নিমগ্ন থাকে তাহা হইলে সেই ব্যক্তির দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন বা অন্য কোনও প্রকার অনুভূতিই তখন হইবে না। অতএব সংক্ষেপে ইহাই বলিতে পারা যায় যে, প্রজ্ঞা ভিন্ন চিন্তাধারার ক্রমিক

১। 'ন হি প্রজ্ঞাপেতং চক্ষু রূপং কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতদ্রূপং প্রজ্ঞাসিষমিতি।'

—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৭

উৎপন্ন হয় না; অর্থাৎ একটি চিন্তা দূর হওয়ার পরই যে অপর একটি চিন্তার উদয় হয় এই প্রকার নিয়ম প্রজ্ঞা ভিন্ন হইতে পারে না। আবার প্রজ্ঞা না থাকিলে কোনও বিষয় জানিতে পারা যায় না। সেজন্যই উপনিষদে বলা হইয়াছে: "প্রকৃত দ্রষ্টাকেই আমাদের জানিতে হইবে। বাক্য বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া উহা যাহার দ্বারা কথিত হইয়াছে সেই বক্তা বা পুরুষকেই জানিতে চেষ্টা করিবে।"[১] অর্থাৎ "সেই বক্তা কোথায় তাহা অনুসন্ধান কর; দ্রষ্টা কোথায় তাহা অনুসন্ধান কর; বাক্যের অর্থ কি তাহা জানিতে চেষ্টা না করিয়া প্রকৃত বক্তাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির কর। দৃষ্টির বিষয় কি, তাহা না ভাবিয়া প্রকৃত দ্রষ্টাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির কর। শব্দ কি, তাহা জানিতে চেষ্টা না করিয়া প্রকৃত শ্রোতা কে তাহাই জানিতে চেষ্টা কর।"

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ 'শব্দ' কি এবং তাহার উৎপত্তি কি প্রকারে হয় ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু শ্রোতা অর্থাৎ যিনি ঐ শব্দ শ্রবণ

১। "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত; বক্তারং বিদ্যাৎ।"……"ন রূপং বিজিজ্ঞাসীত, রূপবিদ্যং বিদ্যাৎ।" "ন শব্দং বিজিজ্ঞাসীত, শ্রোতারং বিদ্যাৎ।"
—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩,৮

করিতেছেন তাহা জানিতে তাঁহারা মোটেই উৎসুক নহেন। পক্ষান্তরে বেদান্তদর্শনাভিজ্ঞ মনীষীগণ সমস্ত বিষয়ের মূল উৎস কোথায় তাহারই অনুসন্ধান করেন। শব্দ বায়ুর কম্পন হইতে জাত কি-না ?—তাহা লইয়া তাহারা ব্যস্ত হন না। একটি শব্দ উৎপন্ন হইতে যে-কোনও প্রকার স্পন্দন বা কম্পনেরই প্রয়োজন হউক না কেন, তাহা আমাদের শ্রবণশক্তির সহিত নিশ্চয়ই সম্বন্ধ থাকিবে। এক্ষণে যদি আমাদের শ্রবণশক্তিটি প্রত্যাহৃত হয় তাহা হইলে কে ঐ শব্দটি শ্রবণ করিবে ? সুতরাং 'শব্দ' এই ব্যাপারটি কি —তাহা জানিবার জন্য সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক কি ? প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়শক্তিগুলির ধর্ম্ম কি তাহা বিদিত হওয়া আবশ্যক ; তাহার পরে উহাদের মূল কোথায় তাহা দেখা প্রয়োজন ; সর্ব্বশেষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের জ্ঞাতা বা উপলব্ধির কর্ত্তা কে তাহাই আমাদের জানা আবশ্যক। কোন খাদ্যের কি প্রকার স্বাদ তাহা জানিতে চেষ্টা না করিয়া কে আস্বাদন করিতেছেন তাহাকেই জানিতে চেষ্টা কর। সুখ ও দুঃখ এই দুইটি কি তাহা না ভাবিয়া যিনি উহাদের অনুভব করিতেছেন তাঁহাকেই বিদিত হও।[১]

এইরূপে 'চিন্তা'-ব্যাপারটি কি তাহা জানিতে চেষ্টা না

১। "নান্নরসং বিজিজ্ঞাসীত। অন্নরসস্য বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ।"
"ন সুখদুঃখে বিজিজ্ঞাসীত। সুখদুঃখয়ো বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ।"

করিয়া যিনি চিন্তা করিতেছেন তাঁহাকে বিদিত হও। এই সকল প্রত্যক্ষের বিষয়গুলির অর্থাৎ চিন্তা, সুখ, দুঃখ ইত্যাদির সহিত প্রজ্ঞার সম্পর্ক আছে এবং ইন্দ্রিয়শক্তি-সমূহের সহিতও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির সম্বন্ধ আছে। যদি বিষয়গুলির সহিত বিষয়ী আত্মার এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ ইত্যাদি বিষয়ের সম্বন্ধ না থাকিত তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য থাকিত না এবং যদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য না থাকিত তাহা হইলে বিষয়গুলিও থাকিত না। কেবল বিষয় অথবা কেবল বিষয়ীর দ্বারা কিছুই সম্পন্ন হয় না।[২]

দেবরাজ ইন্দ্র প্রজ্ঞাকে রথচক্রের মধ্যস্থল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই দেহটি যেন একটি রথ এবং চক্রের পরিধিটি যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ দ্বারা গঠিত। চক্রের নাভি হইতে নেমি পর্য্যন্ত যে দণ্ডগুলি থাকে সেই 'অর'-গুলি যেন বাহ্যবিষয়; প্রকাশক ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহ এবং চক্রের নাভিটি যেন প্রাণ বা জীবনীশক্তি।[৩] উপরোক্ত উপমার দ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে,

---

২। "তা বা এতা দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং, দশ প্রজ্ঞমাত্রা অধি-ভূতং। যদ্ধি ভূতমাত্রা ন স্যু র্ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্যু র্যদ্বা প্রজ্ঞামাত্র ন স্যু র্ন ভূতমাত্রাঃ স্যু। ন হ্যন্যতরতো রূপং কিঞ্চন সিদ্ধেৎ। নো এতন্নানা।"—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৮।৩

৩। "তদ্ যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতো নাভাবরা অর্পিতা, এবমেবৈতা

যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়শক্তিরূপ দণ্ডগুলির উপরে স্থাপিত এবং ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি আবার প্রাণকে আশ্রয় করিয়া আছে। এই প্রাণ বা জীবনীশক্তিকে প্রজ্ঞা ও আত্মা হইতে পৃথক করা যায় না। ইহা জরা-মরণরহিত এবং আনন্দস্বরূপ আত্মা[৪] "সৎকার্য্য অথবা অসৎকার্য্যের দ্বারা আমাদের প্রকৃত স্বরূপের কোনও প্রকার বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। সংসারের পাপ এই আত্মাকে কলুষিত করিতে পারে না কিম্বা ইহার কোনও প্রকার পরিবর্ত্তনও হয় না। আমাদের আত্মা ধর্ম্মাধর্ম্মরহিত; তিনি পাপীও

ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ, স এষঃ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ।"—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৮।৩

যেমন রথচক্রের অরগুলিতে নেমি বা পরিধিস্বরূপ গোলকোর কাষ্ঠখণ্ড স্থাপিত হয় এবং নাভি অর্থাৎ চক্রের মধ্যস্থিত ছিদ্রযুক্ত গোলাকার কাষ্ঠের অরগুলি স্থাপিত হয় সেইরূপ (নেমি স্থানীয় নামাদি বিষয়-গুলিরও অরস্থানীয় ইন্দ্রিয়সমূহের প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং অরস্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলিও নাভিস্বরূপ প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা; ইনিই আনন্দস্বরূপ এবং জরা ও মরণরহিত।"

গীতায় এবং কঠোপনিষদেও এই উদাহরণটি লওয়া হইয়াছে। গ্রীক-দার্শনিক প্লেটোও এই উদাহরণটী দিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষ-হইতেই এই দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিয়াছেন।

৪। "ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ান্। এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ উ

হন না অথবা পুণ্যবান্‌ও হন না। সর্ব্বসময়েই তিনি পূর্ণ ও পবিত্র। সৎ ও অসৎকর্ম্মের সহিত আত্মার কোনও সম্পর্ক নাই বটে, কিন্তু এই সমস্ত কর্ম্মের সহিত জীবাত্মার যথেষ্ট সম্পর্ক আছে, কারণ যাহা-কিছু করা যায় তাহার ফল জীবাত্মাই ভোগ করিবেন; অর্থাৎ 'আমি, আমার' জ্ঞান লইয়া আমরা যেরূপই কর্ম্ম করি না কেন,

এবৈনমসাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যো নুনুৎসত। এষ লোকপাল এষ লোকাধিপতিঃ। এষ সর্বেশ্বরঃ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ।"—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৯

অর্থাৎ "এই আত্মা পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা অধিক হন না, অথবা পাপকর্ম্মের দ্বারাও ন্যূন হন না। যেহেতু এই প্রাণ 'প্রজ্ঞা' উপাধিবিশিষ্ট আত্মাই; স্বর্গাভিলাষী জীবকে এই প্রত্যক্ষ মর্ত্ত্যলোক হইতে ঊর্দ্ধলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন ও তাহাকে পুণ্য কর্ম্ম করান। এই আত্মাই জীবকে এই প্রত্যক্ষ মর্ত্ত্যলোক হইতে অধোলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন এবং তাহাকে অসাধু কর্ম্ম অর্থাৎ পাপকর্ম্ম করান। এই আত্মাই লোকপাল অর্থাৎ সাধু লোককে সুখ এবং অসাধু লোককে দুঃখ প্রদান করেন। এই লোকপাল আত্মাই লোকাধিপতি। এই লোকাধিপতি আত্মাই সর্ব্বনিয়ন্তা। এই সর্বেশ্বরত্ব-গুণসম্পন্ন আত্মাই আমার (ইন্দ্রের) স্বরূপ, ইঁহাকেই অবগত হইতে হয়। উক্ত আত্মাকেই আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে।" তবে ইহা সত্য যে, আত্মা স্বরূপতঃ কাহাকে পাপও প্রদান করেন না, অথবা পাপও দান করেন না। আত্মা নিষ্ক্রিয় ও স্বাক্ষীস্বরূপ।

তাহার ফল আমাদের ভোগ করিতেই হইবে। তাহা ছাড়া আমাদের উত্তমরূপে ইহা বুঝা উচিত যে, প্রজ্ঞা ও জীবনীশক্তি ব্যতিরেকে কোন প্রকার সদসৎ কর্ম্মই সম্পন্ন হইতে পারে না। জ্ঞান ও বুদ্ধির মূল কারণ যিনি—তিনিই এই বিশ্বজগতের অধিপতি ও সকলের পালনকর্ত্তা। তিনিই এই পরিদৃশ্যমান্ বাহ্যজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তিনিই আমার (ইন্দ্রের) প্রকৃত স্বরূপ। এই আত্মজ্ঞান সকল ব্যক্তিকেই অমরত্বের অধিকারী করে। একমাত্র আত্মজ্ঞানই মনুষ্যজাতিকে পূর্ণতার পথে লইয়া যাইতে সমর্থ এবং এই পূর্ণতা লাভ হইলেই যে রাজ্যে চিরশান্তি এবং অনাবিল আনন্দ বিরাজিত সেই রাজ্যে মানব গমন করিতে পারে।"

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মে অস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

আমার সমস্ত অঙ্গ এবং বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন, বল ও ইন্দ্রিয়সমূহ পরিতৃপ্ত হউক। আমি যেন উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি এবং ব্রহ্মও যেন আমাকে পরিত্যাগ না করেন। তাঁহার নিকট আমার এবং আমার নিকট তাঁহার প্রত্যাখ্যান না হউক্। উপনিষদে আত্মার যে সমস্ত ধর্ম্ম কথিত আছে তাহা আত্মনিষ্ঠ আমাতে প্রকাশিত হউক্ ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

চতুর্থ অধ্যায়

আত্মানুসন্ধান

হিন্দুদিগের প্রাচীন পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির সহিত গ্রীস দেশের পৌরাণিক গল্পসমূহের বহু পরিমাণে সাদৃশ্য আছে। এই দুই বিভিন্ন জাতির পুরাণে আমরা দেখিতে পাই যে, দেবতারা ও অসুরেরা নরদেহ ধারণ করিয়া কিরূপে এই পৃথিবীতে মনুষ্যের মত বাস করিয়াছিলেন। দেবতারা এবং অসুরেরা যে এক সঙ্গে বাস করিতেন এবং পরস্পর যুদ্ধ করিতেন তাহার উল্লেখ আমরা প্রাচীন উপনিষদসমূহেও দেখিতে পাই। কথিত আছে যে, এই নিখিল বিশ্বের প্রথম-স্রষ্টা প্রজাপতি একদিন দেবগণকে ও অসুরগণকে বলিয়াছিলেনঃ "তোমরা পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভুত্ব ও ক্ষমতা স্থাপন করিবার জন্য কি কারণে যুদ্ধ করিতেছ? তোমরা আত্মাকে বিদিত হও, কারণ যাঁহার আত্মজ্ঞান আছে তিনিই শান্তি লাভ করেন। আত্মা পাপবর্জ্জিত, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু রহিত। আত্মার শোক নাই, দুঃখ নাই, ক্ষুধা নাই ও তৃষ্ণা নাই। আত্মা সত্যকাম অর্থাৎ আত্মার কামনা কখনও বিফল হয় না বা কখনও অপূর্ণ থাকে না। আত্মা সত্যসঙ্কল্প ও

সত্যে প্রতিষ্ঠিত ; আত্মায় মিথ্যা কিছুই নাই, সুতরাং আত্মার সকল প্রকার চিন্তাও সত্য। সকলেরই এই আত্মাকে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। যিনি এই আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই প্রাপ্ত হইবেন ; তাঁহার অপ্রাপ্য বলিয়া আর কিছুই থাকিবে না। তাঁহার সমস্ত কামনাই পরিপূর্ণ হইবে ; তিনি সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ হইবেন, সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতাই তিনি প্রাপ্ত হইবেন এবং তিনি এই সসাগরা পৃথিবীর ও স্বর্গাদির অধীশ্বর হইবেন।[১] দেবতারা এবং অসুরেরা এই উভয় পক্ষই অতিশয় ক্ষমতা-প্রিয় ও নিতান্ত অসুখী ছিলেন ; সেজন্য তাঁহারা প্রজাপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন যে, তাহা হইলে তো সকল জগতের এবং জীবের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার প্রশস্ত পন্থা পাওয়া গিয়াছে! অতি প্রাচীন ও প্রামাণিক ছান্দোগ্য উপনিষদে উপরি উক্ত উপাখ্যানটি এইস্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ সামবেদের অন্তর্গত।

১। "য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃতুর্বিশোকো
বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ
সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স
সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্
যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ ॥"
—ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮।৭।১

হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকে "বেদ" আখ্যা দেওয়া হয়। এই "বেদ" চারিভাগে বিভক্ত যথা, ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব। বৈদিক যুগে সামবেদের মন্ত্রগুলি গান করা হইত। সেই সামগান হইতে সঙ্গীতের বিজ্ঞান ভারতে উদ্ভূত হইয়াছে। হিন্দুরা সর্ব্বপ্রথম সঙ্গীতে সপ্তস্বর ব্যবহার করিয়াছিলেন। পরে যন্ত্রসঙ্গীতেও সপ্তস্বর ও তিনটি সপ্তক, উদারা, মুদারা ও তারা ব্যবহার করিত। প্রাচীনকালে যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম্মের সময় সামবেদীয় মন্ত্রগুলি সপ্তস্বরে গীত হইত।[২]

সে যাহা হউক, ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে যে, দেবতারা এবং অসুরেরা প্রজাপতির নিকট হইতে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবার গূঢ়তত্ত্বটি জানিতে পারিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে উৎসুক হইলেন। কি প্রকারে এই আত্মার জ্ঞান লাভ হইতে পারে এই বিষয় লইয়া তাঁহারা আপনাদের ভিতর আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং যাহা প্রাপ্ত হইলে আর কোন কিছু পাইতেই বাকি থাকে না—সমস্ত বাসনাই পরিপূর্ণ হয় এবং সমস্ত পৃথিবীরই অধীশ্বর হইতে পারা যায় তাহারই অনুসন্ধানে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

২। ঋক্ ও অন্যান্য প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষাবলীতে এই সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

এইস্থানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এই অসুরগণ ভূত প্রেত জাতীয় জীব নহেন; ইহারা মনুষ্যেরই মতন একটি জাতি ছিলেন, কিন্তু ঘোরতর ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন। জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ধারণাই ছিল না। ইহারা জড়বাদী ছিলেন এবং মনে করিতেন যে, এই জড় দেহই সর্ব্বস্ব, এই দেহের নাশের সহিত সবই শেষ হইয়া যায়। সমস্ত বিশ্বের উপর প্রভুত্ব করিবার অভিলাষ তাহারা সর্ব্বদা হৃদয়ে পোষণ করিতেন, কিন্তু ইহাদের এই বাসনা কোন কালেই পূর্ণ হয় নাই। যাহাদের বাসনা অসংখ্য, তাহাদের অভাবও অসংখ্য। অসুরগণের অবস্থাও ঠিক সেইরূপই হইয়াছিল। আবার কোন একটি বাসনা পূর্ণ হইলে দেখা যায়, অপর বাসনাগুলি আরও তীব্র বেগে জাগ্রত হইয়া উঠে; সেইজন্য অসুররাও সর্ব্বদাই নিজেদের অভাবগ্রস্ত বোধ করিত এবং সর্ব্বাপেক্ষা দেবতাদের অপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও শক্তিমান্ হইবার চেষ্টা করিত। বাস্তবিক ইহসর্ব্বস্ববাদী জড়ভাবাপন্ন এই সমস্ত লোকদেরই বেদে 'অসুর' বলা হইত। আর যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ, আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন, স্বার্থত্যাগী, পরহিতকারী; যাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখ, ঐশ্বর্য্য ও পার্থিবভোগকেই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য না মনে করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে

সাক্ষাৎকার করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন, বেদে তাঁহাদিগকেই 'দেবতা' বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে।[১]

এই সকল দেবতারা এবং অসুরগণ স্থির করিলেন যে, যদি তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান তাঁহাকে কোনও সত্যদর্শী ঋষির নিকট আত্মজ্ঞান লাভের উপায় জানিবার জন্য পাঠাইতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহাদের নিকট হইতে উহা শিক্ষা করিবার সুবিধা হইবে। এইরূপ মনে করিয়া দেবগণ ইন্দ্রের নিকট এবং অসুরগণ বিরোচনের নিকট গমন করিলেন। উভয়পক্ষই তাহাদের

১। ভগবদ্‌গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোকদিগের বিষয় বর্ণিত আছে ; যথা,

"অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥

* * * *

অধিপতিকে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধানে গমন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বস্তুতঃ উভয়পক্ষেরই সর্ব্বপ্রকার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ছিল; মনুষ্যের যত প্রকার পার্থিব ভোগ্য বিষয়ের অভিলাষ থাকিতে পারে, তাহার কোনটিরই তাহাদের অভাব ছিল না। যদিও তাঁহাদের প্রচুর ধন, সম্পত্তি ও বিলাস সামগ্রী ছিল, যদিও তাঁহারা অসীম মানসিক শক্তিসম্পন্ন (psychic power) ছিলেন এবং যাহা কামনা করিতেন তাহাই প্রাপ্ত হইতেন, তথাপি এই সকল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও তাঁহাদের বিষয়ভোগের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় নাই। তাঁহারা সর্ব্বদা অতৃপ্ত বাসনাজনিত

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥"

—গীতা ১৬।১-১২

দুঃখই অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহাদের যে সকল শক্তি ও সামর্থ্য ছিল তাহা অপেক্ষা অধিকতর শক্তি ও ক্ষমতা পাইবার জন্য তাঁহারা লালায়িত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা যখন প্রজাপতির নিকট শুনিলেন যে, এমন কোন বস্তু আছে যাহা প্রাপ্ত হইলে নিখিল বিশ্বের অধিপতি হইতে পারা যায়, তখন তাঁহারা ঐ শ্রেষ্ঠ বস্তুটি অবিলম্বে লাভ করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

তাহারপর দেবরাজ ইন্দ্র এবং অসুরপতি বিরোচন আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের অনুসন্ধানে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যাত্রা করিলেন। উভয়েই সেই সময়ে সর্ব্বপ্রকার ভোগ-বিলাস বর্জ্জন করিলেন; তাঁহাদের সুন্দর পরিচ্ছদাদি, যাবতীয় ঐশ্বর্য্য ও বিলাসদ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া এবং এমন কি পরস্পরের সহিত কোনও সংশ্রব না রাখিয়া জিজ্ঞাসুর ন্যায় দীন ও সরলভাবে সকলের অপেক্ষা বিজ্ঞ ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা ঠিক ঐরূপ সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ কোথাও অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া অবশেষে প্রজাপতির সমীপে শাস্ত্রবিধি অনুসারে সমিৎপাণি হইয়া পূজোপহার নিবেদন-পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। হিন্দুশাস্ত্রমতে রিক্তহস্তে গুরু, দেবতা ও রাজার নিকট যাওয়া নিষিদ্ধ। এইজন্য তাঁহারা হব্য, ফল এবং যজ্ঞকাষ্ঠাদি প্রজাপতিকে ভক্তিপূর্ব্বক

নিবেদন করিলেন। তৎপরে তাঁহার সম্মতি পাইয়া তাঁহারা তাঁহার শিষ্যরূপে পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিলেন এবং বিধিপূর্ব্বক গুরুর সেবা করিয়া বত্রিশ বৎসর গুরুর নিকট বাস করিলেন। একদিন প্রজাপতি তাঁহার শিষ্যদ্বয়কে তাঁহার নিকট আসিবার কারণ কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে তাঁহারা দুইজনেই উত্তর করিলেন : "ভগবন্, আপনি বিশ্বজগতের বিধাতা প্রজাপতি ; আপনার নিকট শুনিয়াছি যে, যদি কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পরম সুখী হয়, তাহার সমস্ত প্রকার শক্তিলাভ হয়, কিছুই আর তাহার অপ্রাপ্তব্য বলিয়া বাকি থাকে না। এই আত্মা আবার পাপ ও জরারহিত অজর এবং অমর ; এই আত্মার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা কিছুই নাই ; ইনিই সত্যকাম অর্থাৎ ইঁহার যাবতীয় কামনা সর্ব্ব সময়েই পরিপূর্ণ হইয়া থাকে ; ইনিই সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ ইহার চিন্তাও কখনও নিষ্ফল হয় না। আমরা এই প্রকার আত্মাকে জানিবার অভিলাষে আপনার শরণাগত হইয়াছি, আপনি উপদেশ দান করুন।

ইন্দ্র ও বিরোচনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞ প্রজাপতি শিষ্যদ্বয়ের বুদ্ধি শুদ্ধ কি-না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য একেবারেই তাঁহাদের ঈপ্সিত আত্মজ্ঞান দান করিলেন না, প্রকারান্তরে তিনি তাঁহাদিগকে কয়টি

উপদেশ দিলেন যাহা দ্বারা তাঁহারা অন্তরস্থিত আত্মার অনুসন্ধান করিয়া সেই আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। যে আচার্য্য তাঁহার শিষ্যদিগকে প্রত্যক্ষানুভূতির পথে ক্রমে ক্রমে পরিচালিত করেন এবং যাহাতে শিষ্যেরা নিজ চেষ্টায় সেই একমাত্র সত্যবস্তুকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন সেরূপ উপায় অবলম্বন করেন সেই আচার্য্যই শ্রেষ্ঠ। এজন্য প্রজাপতি বলিলেনঃ "বৎসগণ, চক্ষুতে যাঁহাকে দেখা যায় তিনিই সেই আত্মা। এই আত্মাই জন্ম, শোক, দুঃখ ও পাপবর্জ্জিত। ইঁহার মৃত্যু নাই বা মৃত্যুর শঙ্কাও নাই। এই পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া লোক সমগ্র পৃথিবী ও ঈপ্সিত বিষয় সকল পাইতে পারে।"[১] প্রজাপতির এইপ্রকার কথা শুনিয়া তাঁহারা সংশয়ে পড়িলেন। "চক্ষুতে যাঁহাকে দেখা যায় তিনিই আত্মা" এই বাক্যের গূঢ় অর্থ ইন্দ্র ও বিরোচন ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ভাবিলেন যে, চক্ষুর তারাতে যে ছায়া দেখা যায়, ঐ ছায়াকেই বোধ হয় গুরুদেব 'আত্মা' বলিয়াছেন। বস্তুতঃ আমরা যদি কাহারও চক্ষুর তারকাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি তাহা হইলে আমাদেরই প্রতিবিম্বটি ক্ষুদ্র ছায়াকারে ঐ চক্ষুর

১। "তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি।" —ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮।৭।৪

তারকাতে প্রতিফলিত দেখিয়া থাকি। প্রজাপতি অবশ্য এইপ্রকার ছায়াকে আত্মা বলিয়া মনে করিবার উপদেশ দান করেন নাই। তিনি কেবল শুদ্ধচিত্ত যোগিগণ যাঁহাকে দ্রষ্টারূপে অনুভব করিয়া থাকেন সেই দর্শনকর্ত্তা ও ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক আত্মরূপী পুরুষকেই উল্লেখ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃত অর্থগ্রহণে অসমর্থ হইয়া ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন: "ভগবন্, যাঁহাকে দর্পণে বা সলিলের ভিতর দেখা যায়—তিনি কে? চক্ষুর মধ্যে যাঁহাকে দেখা যায় তিনিও কি সেই একই পুরুষ?"[২] শিষ্যেরা যে প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারে নাই ইহা বুঝিতে পারিয়া প্রজাপতি উত্তর করিলেন: "অবশ্য তোমরা যাহা বলিতেছ সেই সমস্ত পদার্থের ভিতরেও আত্মাকে দেখা যায়, সুতরাং সেই আত্মাকে বিদিত হও এবং উপলব্ধি কর।" প্রজাপতি তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের বুদ্ধিশক্তি আরও ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য আবার বলিলেন: "একটি জলপূর্ণ পাত্রে তোমাদের আকৃতি নিরীক্ষণ করিও এবং তাহাতে আত্মাকে দর্শন করিতে পাও কি-না তাহা আমাকে বলিও।"

২। "অথ যোহয়ং ভগবোঽপ্সু পরিখ্যায়তে যশ্চায়মাদর্শে কতম এষ ইত্যেষ উ এবৈষু সর্ব্বেষেতেষু পরিখ্যায়ত ইতি হোবাচ।" —ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮।৭।৪

অনুগত শিষ্যদ্বয় গুরুর আদেশানুযায়ী জলের মধ্যে তাঁহাদের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন : "ভগবন্, আপনি যাহা দেখিবার জন্য আমাদের পাঠাইয়াছিলেন তাহা দেখিয়াছি।" ইহা শ্রবণ করিয়া প্রজাপতি বলিলেন : "কিন্তু তোমরা প্রকৃতপক্ষে আত্মা দেখিয়াছ, না আর-কিছু দেখিয়াছ?" শিষ্যেরা বলিলেন : "ভগবন্, আমরা জলের মধ্যে মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত আমাদের আকৃতি স্পষ্টভাবে দেখিয়াছি, উহার মধ্যে আমাদের শরীরের কোনও অংশের ব্যতিক্রম হয় নাই—এমন কি আমাদের কেশ ও নখর পর্য্যন্ত দেখিয়াছি।" প্রজাপতি তখন তাঁহাদিগের সংশয় অপনোদনের জন্য আবার সস্নেহে বলিলেন : "তোমরা তোমাদের কেশ ও নখর সংস্কার করিয়া উত্তম বেশভূষাদিতে সজ্জিত হইয়া পুনরায় জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে দৃষ্টিপাত কর এবং যাহা দেখিতে পাও তাহা আমাকে বল।" তখন ঐ শিষ্যদ্বয় প্রজাপতির আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিবার জন্য কেশ ও নখরাদির সংস্কার সাধন করিয়া বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইলেন ও জলের মধ্যে তাঁহাদের প্রতিবিম্ব দেখিলেন। তাহার পর প্রজাপতি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন : "বৎসগণ, তোমাদের স্বরূপ বা আত্মাকে কি দেখিতেছ?" তাঁহারা উত্তর করিলেন: "ভগবন্, আমরা এখন যেমন পরিষ্কৃত বেশভূষায় সজ্জিত আছি ঠিক সেইরূপ

অবস্থাতেই আমাদের দেখিতেছি।” তাহা শুনিয়া প্রজাপতি বলিলেন: “উহাই তোমাদের আত্মার স্বরূপ, উহাই সেই দুঃখ ও ভয়বর্জ্জিত অবিনশ্বর ব্রহ্ম; উহাকে ভাল করিয়া বিদিত হও এবং উপলব্ধি কর।” ইহা শুনিয়া শিষ্যদ্বয় শান্তচিত্তে প্রস্থান করিলেন। আচার্য্যরূপী প্রজাপতি তাহাদিগকে বহুদূরে চলিয়া যাইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে পুনরায় আহ্বান করিয়া বলিলেন: “তোমরা তোমাদের আত্মস্বরূপের যথার্থ জ্ঞান লাভ না করিয়াই চলিয়া যাইতেছ, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই ভ্রান্ত আত্মবিদ্যা অনুসরণ করিবে সেইই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।” ইন্দ্র এবং বিরোচন উভয়েই প্রজাপতির এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়াও কিন্তু আর প্রত্যাগত হইলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের আত্মস্বরূপকে সত্যসত্যই উপলব্ধি করিয়াছেন, সুতরাং কোন সংশয় না রাখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহারা নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান করিলেন, প্রজাপতির কথায় আর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না।

অতঃপর বিরোচন স্থূল দেহই আত্মার স্বরূপ এই নিশ্চয় করিয়া অসুরগণের সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তাঁহাদিগের নিকট ‘দেহাত্মবাদ’[১] প্রচার করিতে লাগিলেন।

১। স্থূল ও জড় দেহই আত্মা—এই তত্ত্ব উপদেশ দিতে লাগিলেন

তিনি অসুরদিগকে আধুনিক নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদীদের[২] মতানুযায়ী জড়বাদের উপদেশগুলি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন : "স্থূল দেহই আমাদের আত্মা; কেবল এই দেহেরই পরিচর্য্যা করিতে হইবে এবং এই দেহকেই পূজা করিতে হইবে। এইরূপে স্থূল দেহের পূজা ও সেবার দ্বারা আত্মা মহিমান্বিত হইবেন। যিনি দেহকে আত্মা জানিয়া ইহার পরিচর্য্যা করিবেন তিনিই সমগ্র পৃথিবীর এবং স্বর্গাদি লোকের অধীশ্বর হইতে পারিবেন; সমস্ত বস্তুই তাঁহার করতলগত হইবে।" অসুরেরা বিরোচনের উপদেশানুযায়ী সম্পূর্ণভাবে দেহাত্মবাদী হইয়া স্থূল শরীরটিকেই নানাবিধ বেশভূষায় সুসজ্জিত করিয়া তাহার পূজা করিতে লাগিল। বাস্তবিক দেখা যায় যে, অসুর প্রকৃতিসম্পন্ন লোকেরা আজিও দেহের পরিচর্য্যা করিয়া ত্রিভুবন জয় করিব এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে।

বর্ত্তমানকালেও পৃথিবীতে এইরূপ অসুর প্রকৃতির লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, যাঁহারা অজ্ঞেয়বাদী, জড়বাদী এবং স্বার্থসুখ পাইবার জন্যই সর্ব্বদা লালায়িত তাঁহাদের মধ্যেই আসুরিক প্রবৃত্তিসমূহ পরিলক্ষিত হয়। এই শ্রেণীর

২। মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জানিবার উপায় নাই—এই মত যাঁহারা পোষণ করেন তাঁহাদিগকে 'অজ্ঞেয়বাদী' বলে।

লোকেরা নিজেদের শরীর ব্যতীত অন্য আর কিছু চিন্তা করেন না! ইহাদের মধ্যে 'দয়া' বলিয়া কোন গুণ নাই; দরিদ্রকে ইহারা এক মুষ্টি ভিক্ষা দিতেও কাতর হয়। নিজের ইন্দ্রিয়-সুখ ভিন্ন অন্য কোন উচ্চতর আধ্যাত্মিক আদর্শ ইহাদের নাই। ইহারা স্থূল দেহকেই আত্মা বলিয়া জানে; স্থূল দেহের অতীত আর কোন বস্তুর অস্তিত্ব ইহারা স্বীকার করে না। আধুনিক আসুরিক প্রকৃতির মনুষ্যেরাও ভগবানের উদ্দেশ্যে কোন সৎকর্ম্ম করেন না। ইহারা জীবিত বা মৃত দেহটিকে বিচিত্র বেশভূষায় ও গন্ধ-পুষ্পাদিতে সজ্জিত করেন। ইহাদের ধারণা যে, দেহের এইরূপ পরিচর্য্যা করিয়াই মাত্র সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে পারা যায়।

সে যাহা হউক, এদিকে সুরপতি ইন্দ্রের বুদ্ধি বিরোচন অপেক্ষা কিছু সূক্ষ্ম ছিল। তিনিও নিজ আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু তিনি যে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছেন তাহা দেবগণের মধ্যে প্রচার করিতে দ্বিধা বোধ করিতে লাগিলেন। প্রজাপতি বলিয়াছিলেন যে, আত্মস্বরূপের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জন্ম, মৃত্যু, শোক কিছুই নাই এবং তিনি নিত্য বস্তু। এই অমূল্য বাক্য স্মরণ করিয়া ইন্দ্র মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন: "তাহা হইলে এই স্থূল দেহ তো কখনও আত্মা হইতে পারে না! কারণ এই দেহ

পরিবর্ত্তনশীল ; ইহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি সমস্ত বিকারই আছে। যখন এই দেহ জন্ম, জরা ও মৃত্যুর অধীন তখন আচার্য্যদেব কি করিয়া এই জড় ও স্থূল দেহের প্রতিবিম্বকেই আত্মা বলিয়া অভিহিত করিতে পারেন? আমি তো এই উপদেশের কোনই সার্থকতা দেখি না!" এইরূপে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র শিষ্যের ন্যায় পূজোপহার হস্তে লইয়া পুনরায় প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতিও দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "তুমি সত্য-স্বরূপ আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিয়াছ এবং আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছ এইরূপ ধারণা করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বিরোচনের সহিত চলিয়া গিয়াছিলে, এক্ষণে তোমার প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ কি?" ইন্দ্র বিনম্রভাবে উত্তর করিলেন: "ভগবন্, যখন এই স্থূল দেহের পরিবর্ত্তনের বিরাম নাই তখন এই দেহের প্রতিবিম্বটি কি করিয়া আত্মার প্রকৃত স্বরূপ হইতে পারে? যদি স্থূল দেহকে বেশভূষা ও পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সজ্জিত করা যায় তাহা হইলে ছায়ারূপী স্বরূপের আকৃতিও ভিন্ন হইয়া যায়। চক্ষুদ্বয় নষ্ট হইলে দেহের প্রতিবিম্বরূপী আত্মাও তাহা হইলে অন্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে; আবার দেহটি খঞ্জ হইলে প্রতিবিম্বরূপী আত্মাও খঞ্জ দেখাইবে। দেহটি বিকলাঙ্গ হইলে আত্মাও বিকলাঙ্গ দেখাইবে এবং সর্ব্বশেষে দেখিতেছি যে, দেহের নাশ হইলে আত্মারও নাশ

হইয়া যাইবে; সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল দেহের প্রতিবিম্বটি কখনই আত্মা হইতে পারে না। আমিও এই শিক্ষার কোন সার্থকতা দেখিতেছি না। আপনি কৃপা করিয়া আমার সংশয় দূর করিয়া দিন এবং যাহাতে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ আমি বুঝিতে পারি সেই প্রকার উপদেশ প্রদান করুন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া আচার্য্য প্রজাপতি উত্তর করিলেন: "ইন্দ্র, তুমি যাহা বলিলে তাহা যুক্তিসঙ্গত। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা আমি ব্যাখ্যা করিব। তুমি আমার নিকট শিষ্যরূপে আরও বত্রিশ বৎসরকাল বাস কর।"

ইন্দ্র গুরুসেবাপরায়ণ হইয়া তথায় আরও বত্রিশ বৎসর যাপন করিলেন। ইন্দ্রের পবিত্রতা, ব্রহ্মচর্য্য ও ভক্তিতে প্রীত হইয়া প্রজাপতি একদিন তাঁহাকে বলিলেন: "যিনি নিদ্রাকালে বহুবিধ স্বপ্নবিষয় ভোগ করেন, তিনিই আত্মা, তিনিই অমৃত ও ভয়হীন ব্রহ্ম। ইঁহাকে উপলব্ধি কর, ইঁহার অনুভূতি লাভ কর।"[১] এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র শান্ত হৃদয়ে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু অন্যান্য দেবতা-গণকে এই সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে তিনি পুনরায় দেখিলেন যে, আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার তখনও সন্দেহ

১। "য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতম-ভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি।"—ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮।১০।১

রহিয়াছে। তিনি চিন্তা করিয়া বুঝিলেন দেহের ছায়া বা প্রতিবিম্ব এবং স্বপ্নবিষয় যিনি ভোগ করেন সেই শুদ্ধ আত্মা ও দেহ এক নয়; কারণ বাহ্য আকারের পরিবর্ত্তন হইলে তো শুদ্ধ আত্মার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না? যদি দেহটি চক্ষুহীন হয়, কই শুদ্ধ আত্মা তো অন্ধ হন না? দেহ খঞ্জ হইলে অথবা দেহের কোনও প্রকার অনিষ্ট হইলে শুদ্ধ আত্মা তো কই খঞ্জ বা তাঁহার কোনও অনিষ্ট হয় না? সুতরাং স্থূল শরীরের দোষে বা বিকারে এই স্বপ্নদ্রষ্টা শুদ্ধ আত্মা কখনই দূষিত বা বিকৃত হন না। তাহার পর দেহস্থিত যে পুরুষ স্বপ্নজাত বিষয়সমূহ ভোগ করেন, তিনিই বা কিরূপে অপরিবর্ত্তনশীল আত্মা হইতে পারেন, কেননা তাঁহাকেও তো দুঃখদায়ক স্বপ্ন প্রভৃতি দর্শন করিয়া যন্ত্রণাদি ভোগ করিতে হয় এবং স্থূল দেহের মতন তাঁহাকেও তো নানা-প্রকার পরিবর্ত্তন ও ভয়ের অধীন হইয়া থাকিতে হয়? এইরূপে মনে মনে আলোচনা করিয়া ইন্দ্র বলিলেন: "আমি এই উপদেশে কোনই সুফল দেখিতেছি না। আবার আমি গুরুদেবের নিকট যাইব এবং তাঁহাকে এই সমস্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিব।" এই বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ইন্দ্র সমিৎ-পাণি হইয়া প্রজাপতির নিকট তৃতীয়বার উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: "ভগবন্, আপনার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, আত্মা অপরিবর্ত্তনশীল, অমর এবং জন্ম, জরা, মৃত্যু,

শোক, দুঃখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি বর্জ্জিত; কিন্তু তাহা হইলে স্বপ্নদর্শী পুরুষ কিরূপে আত্মা হইতে পারেন ?" ইহা শ্রবণ করিয়া আচার্য্য প্রজাপতি বলিলেন: "ইন্দ্র, তুমি ঠিকই বলিয়াছ। আত্মা সম্বন্ধে আমি তোমায় পুনরায় উপদেশ প্রদান করিব, তুমি আমার নিকট আরও বত্রিশ বৎসর বাস কর।"

পুনরায় এই নির্দ্দিষ্ট বত্রিশ বৎসর অতীত হইয়া গেলে প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিলেন: "গভীর নিদ্রাবস্থায় অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় যিনি সাক্ষী স্বরূপ শান্ত থাকেন, অর্থাৎ যিনি সেই সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারশূন্য আর কোনও স্বপ্নাদি দর্শন করেন না, তিনিই সেই মৃত্যুহীন অজর অমর আত্মা।" ইন্দ্র এইপ্রকার কথা শ্রবণ করিয়া শান্ত হৃদয়ে চলিয়া গেলেন। কিন্তু দেবতাদিগের নিকট যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্বেকার ন্যায়ই আবার সন্দেহ উপস্থিত হইল এবং তিনি বলিলেন: "যখন 'আমি ও আমার'-রূপ অহং-জ্ঞানই সুষুপ্তিতে থাকে না তখন এই শান্ত অবস্থাই কিরূপে আত্মা হইতে পারেন ? সুষুপ্তি অবস্থায় কোনও প্রকার বাহ্যজ্ঞান না থাকিলে আচার্য্যদেব কি সর্ব্বপ্রকার চিন্তা, অনুভূতি এবং জ্ঞানের শূন্যাবস্থাকেই 'আত্মা' বলিয়াছেন ?" বাস্তবিক সুষুপ্তির অবস্থায় আমাদের কোনও প্রকার বাহ্যজ্ঞান থাকে না। তখন আমরা স্বপ্নাদিও দর্শন

করি না, তখন মনের মধ্যে সুখ-দুঃখাদি ভাবের অনুভূতি ও কেবল অহং-জ্ঞান থাকে, কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্যও থাকে না। এইপ্রকার শূন্যাবস্থা কিরূপে আত্মা হইতে পারেন তাহা ধারণা করিতে না পারিয়া সমিৎপাণি হইয়া ইন্দ্র পুনরায় প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি ইন্দ্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পুনরায় আসিবার কারণ কি? ইন্দ্র বলিলেন: "অহং-জ্ঞানশূন্য, বাহ্যজ্ঞান এবং বিষয়ানুভূতি-রহিত অবস্থাকেই কি আপনি 'আত্মা' বলিয়াছেন?" প্রজাপতি উত্তর করিলেন: "না, তাহা নহে।" এইস্থানে আমরা বুঝিতে পারি যে, বিচক্ষণ আচার্য্যগণ কিরূপে তাঁহাদের শিষ্যবর্গকে স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর রাজ্যে ক্রমশঃ লইয়া যাইয়া সর্ব্বশেষে সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ প্রদান করেন।

আমরা যদি চিন্তা, অনুভূতি ও ভাবরাজ্যের উপরে সুষুপ্তির অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া আরও উপরে অগ্রসর হইতে পারি তাহা হইলেই আত্মসাক্ষাৎকার হইতে পারে। প্রজাপতি ইন্দ্রের পুনরাগমনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন: "তুমি বুদ্ধিমান্, আমি তোমাকে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে আরও কিছু বলিব। তুমি আমার নিকট আরও পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া বাস কর।"

ইন্দ্র তাহাই করিলেন এবং সেই পাঁচ বৎসর অতীত হইলে

প্রজাপতি ইন্দ্রকে উচ্চতম জ্ঞান প্রদান করিলেন। ইন্দ্রও চিন্তা করিলেন যে, এই দৃশ্যমান স্থূল শরীর 'আত্মা' হইতে পারে না; ইহা মরণশীল, বস্তুতঃ ইহা সর্ব্বদা মৃত্যুগ্রস্ত।[১] এই দেহ যতদিন থাকে ততদিন ইহা প্রতিমুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হয়। দেহের প্রত্যেক পরমাণুর অবিরাম পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং এই পরিবর্ত্তনক্রিয়া যদি অল্প সময়ের জন্য বন্ধ হয় তাহা হইলে দেহের বিনাশ হইবে। এই শরীরের সর্ব্বদাই মৃত্যু হইতেছে; সর্ব্বদাই ইহার মধ্যে মৃত্যুর ক্রিয়া চলিতেছে। এইস্থলে 'শরীর' শব্দে ইন্দ্রিয় ও মনসংযুক্ত শরীর বুঝিতে হইবে। এই শরীরই আত্মার আবাসস্থান বা যন্ত্রস্বরূপ; কিন্তু আত্মা দেহ রহিত ও অমর। এই দেহরূপ যন্ত্রের সাহায্যেই আত্মা বাহ্যজগতের সংস্পর্শে আসেন মাত্র। যদি আত্মা এই স্থূল শরীর নির্ম্মাণ না করিতেন তাহা হইলে তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদির সংস্পর্শে আসিয়া ইহাদের ভোগ করিতে পারিতেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আত্মার ভোগের জন্যই এই শরীরের সৃষ্টি এবং স্থায়িত্ব।

১। "মঘবন্ মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানমাত্তো বৈ স শরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ স শরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।"
—ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮।১২।১

আত্মা দেহেতে অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়াই জীব দেহাভিমানী হইয়া থাকে এবং 'আমার এই শরীর' ইত্যাকার ধারণা করিয়া সুখ, দুঃখ, শীত, উষ্ণ প্রভৃতি অনুভব করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শরীর কিছুই অনুভব করে না। আত্মাই দেহের কর্ত্তা ও অধিপতি; শরীরটি তাঁহার বাসগৃহ মাত্র।

যিনি ইন্দ্রিয়সকলকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া বাহ্য-বিষয়সমূহ গ্রহণ করেন তিনিই আমাদের অন্তরস্থ আত্মা। ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলির সহিত বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শ হইলেই ইন্দ্রিয়-বিষয়ের অনুভূতি হইয়া থাকে। যতক্ষণ আত্মা দেহরূপ স্থূল আকারের মধ্য দিয়া প্রকাশিত না হন ততক্ষণ স্থূল বাহ্যবস্তুগুলি আকারবিশিষ্ট বলিয়া সাক্ষাৎভাবে আত্মার সংস্পর্শে আসিতে পারে না। কিন্তু এই দেহের জ্ঞাতা, সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-বিষয়ানুভূতির ভোগকর্ত্তা এবং যাবতীয় কার্য্যের কর্ত্তা সেই আত্মা স্বভাবতঃই অরূপ অর্থাৎ তাঁহার কোনও আকার নাই। প্রজাপতি ইন্দ্রকে সেজন্য বলিলেন: "আত্মার বিশেষ কোনও প্রকার আকার নাই। আত্মা দেহের মধ্যে কোনও প্রকার আকারবিশিষ্ট না হইয়া বিরাজ করেন।" এক্ষণে মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেহের আকার থাকিলেও আত্মার কোনই আকার নাই এবং ইহা অনুভব করিলেই

দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আত্মার যে কোনও পরিবর্ত্তন হয় না—এই কথা আমরা বুঝিতে পারিব। সুতরাং আত্মা যদি অরূপ হন তাহা হইলে দেহের ছায়া বা প্রতিবিম্ব কিরূপে আত্মা হইতে পারে? অসুররাজ বিরোচনের বুদ্ধি তমোগুণে আবৃত ও তাঁহার মন অপবিত্র ছিল এবং সেইজন্যই তিনি আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন নাই। তিনি যদি পরে ঐ বিষয়ে আর কোনও প্রশ্ন করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই প্রজাপতি সেই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেন এবং সেজন্যই তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু বিরোচন আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সমস্তই অবগত হইয়াছেন এই মনে করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি জ্ঞান-লাভের যোগ্য পাত্র নহেন এই বিবেচনা করিয়া প্রজাপতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ও স্বীয় শক্তি সঞ্চার করিয়া বিরোচনকে জ্ঞান দান করিতে উৎসুক হন নাই। আর এই কারণেই বিরোচনও সেই অরূপ ও অমর আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হন নাই।

যাবতীয় ইন্দ্রিয়, সর্ব্বপ্রকার ঐন্দ্রিয়িক বিষয়ের অনুভূতি এবং দেহ সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ই ক্ষণস্থায়ী। আমরা এই সত্য উপলব্ধি করিলে অবিনশ্বর আত্মা ও বিনশ্বর দেহ যে এক নহে তাহা বুঝিতে পারিব। কিছুকালের জন্য এই নাম-

রূপহীন আত্মা দেহের মধ্যে বাস করেন এবং ইহা পরিত্যাগ করিবার পরেও দেহরূপ আকারের অতীত হইয়াই থাকেন। যতক্ষণ এই আত্মা কাহারও দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকেন ও সেই দেহধর্ম্মযুক্ত হন ততক্ষণই আত্মা সুখ ও দুঃখ-ভোগ হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। কিন্তু যিনি এই নির্লিপ্ত আত্মাকে দেহ হইতে পৃথকভাবে অবস্থিত দেখেন, তাঁহার আর সুখ ও দুঃখ বোধ থাকে না।

এখানে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, নাম-রূপহীন আত্মা কিরূপে আকারবিশিষ্ট দেহের মধ্য দিয়া প্রকাশ হইতে পারেন? ইন্দ্রেরও এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহা দূর করিবার জন্যই প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিলেন[১]: "কিন্তু আমরা জানি যে, বায়ুর কোনও রূপ বা আকার নাই, বাষ্পেরও কোন আকার নাই, তড়িৎশক্তিরও কোনও

১। (ক) "অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎস্তনয়িত্নুরশরীরাণ্যেতানি, তদ্ যথৈতান্যমুষ্মাদাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে॥ —ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮।১২।২

(খ) "এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপ-সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং স যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্তঃ, এবমেবায়মস্মিঞ্ছরীরে প্রাণো যুক্তঃ॥" —ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮।১২।৩

আকার নাই, কিন্তু ইহারা অন্য কোন আকারের মধ্য দিয়াই প্রকাশমান হয়। যদিও বায়ুর কোনও আকার নাই তথাপি বায়ু যখন বহিতে থাকে তখন ইহা আকারবিশিষ্ট বস্তুগুলির সংস্পর্শে আসিয়া উহাদের সঞ্চালন করে এবং তাহার দ্বারাই বায়ুর আকার ও ক্ষমতা প্রকাশিত হয়। এইরূপ বাষ্পও আকারশূন্য, কিন্তু বাষ্পীয় যানের দ্বারা আমরা ইহার বিশাল শক্তির প্রকাশ দেখিয়া থাকি। আমাদের উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডল (atmosphere) তড়িৎ-শক্তিতে পরিপূর্ণ হইলেও আমরা উহা দেখিতে পাই না, কিন্তু বিদ্যুতের দীপ্তি বা বজ্রপাত ইত্যাদিতে উহার অস্তিত্বের পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। আমরা বাস্তবিক এই বায়ুমণ্ডলস্থিত তড়িৎ-শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করি না। মার্কনি (Merconi) নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারের জন্যই তড়িৎ-প্রবাহের উপকারিতা আমরা উপলব্ধি করিয়াছি। বেতারবার্ত্তাতেও এইপ্রকার তড়িৎ-শক্তির আমরা পরিচয় পাইয়া থাকি। বাস্তবিক কেহ কখনও কোন অরূপ শক্তিকে চক্ষুদ্বারা দর্শন বা হস্তদ্বারা স্পর্শ করেন নাই, তবে ইহাদের অস্তিত্ব কোনও আকারের (পদার্থের) উপর প্রকাশিত হইলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। যেমন অবস্থাবিশেষে সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের অগোচর অরূপ শক্তিসমূহকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারা যায় সেইরূপ এই আত্মা স্বভাবতঃ অতীন্দ্রিয় হইলেও

স্থূল দেহের মধ্য দিয়াই ইহার ক্ষমতা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের অন্তরে চিন্তারূপে প্রকাশিত না হইলে আত্মার যে চিন্তাশক্তি আছে তাহা কিরূপে জানা যাইবে? এইপ্রকারে আত্মার দর্শনশক্তি ও অনুভবশক্তির অস্তিত্ব উহাদের বহিঃপ্রকাশের দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। যদি কোনও ব্যক্তির দর্শনশক্তির প্রকাশ না থাকে তাহা হইলে আমরা তাহাকে 'অন্ধ' বলিয়া থাকি। যাহার মানসিকশক্তি ও বোধশক্তি সুপ্তভাবে থাকে তাহাকে আমরা 'মূঢ়' বলিয়া থাকি; কিন্তু যখনই এই সমস্ত শক্তি ব্যক্ত বা প্রকাশমান হয় তখনই আমরা ইহাদের কার্য্য দেখিতে পাই। যদি দেহের মধ্য দিয়া দৃষ্টিশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, আস্বাদনশক্তি, স্পর্শশক্তি, চিন্তাশক্তি ইত্যাদির প্রকাশ দেখা না যাইত তাহা হইলে জীবাত্মার অন্তরে নিহিত ঐ সকল শক্তিসম্বন্ধে আমরা কিছুই অনুমান করিতে পারিতাম না। ঐ শক্তিগুলি আমাদের অন্তরস্থ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হইতেই উৎপন্ন হয়। অবিদ্যাবশতঃ এবং দেহাত্মভ্রমের জন্য আমরা মনে করি যে, ঐ সমস্ত শক্তি দেহ হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু যখন আত্মজ্ঞানরূপ সূর্য্যের উদয় হয় তখন অজ্ঞানের সমস্ত অন্ধকার দূরে চলিয়া যায় এবং সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন চৈতন্যময় আত্মা দেহ হইতে পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হন। যেমন কোন মূঢ় ব্যক্তি আকাশ

হইতে বায়ু, মেঘ এবং তড়িৎশক্তির পার্থক্য দেখিতে পায় না, সেইরূপ আত্মজ্ঞানরহিত মূঢ় ব্যক্তিও আত্মাকে স্থূল ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌রূপে দেখিতে পায় না। যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন কেবল তিনিই ইহা উপলব্ধি করেন যে, আত্মাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুরুষ। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বদাই সুখী এবং সেজন্য তিনি স্থূল-দেহের সুখ-দুঃখাদি চিন্তা না করিয়া খেলাধূলার মতনই পার্থিব জীবনের সকল অবস্থাকে উপভোগ করেন। তিনি তাঁহার স্থূল দেহকে চৈতন্যস্বরূপ আত্মার আবাস স্থান বলিয়াই জানেন, স্থূল দেহে কখনও আসক্ত হন না। আমরা পূর্ব্বেই বিচার করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, আত্মাতে প্রজ্ঞা আছে এবং প্রাণশক্তি আছে। এই প্রজ্ঞা ও প্রাণশক্তি পরিদৃশ্যমান বাহ্যজগতের অধিষ্ঠানরূপে বর্ত্তমান। যখন এই 'প্রজ্ঞা' ও 'প্রাণ' সুপ্তভাবে থাকে তখন বাহ্যজগতের কোনও প্রকার ক্রমবিকাশ হয় না। ব্যাপকভাবেই হউক বা আণবিকই হউক, জগতে যতপ্রকার কম্পন আছে এবং যতপ্রকার গতি আমরা অবগত আছি তাহা প্রাণশক্তির ক্রিয়া বা বিকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। প্রজ্ঞার প্রকাশ মনুষ্যজাতির মধ্যে—এমন কি ইতরপ্রাণীর মধ্যেও দেখা যায়। স্বরূপতঃ এই প্রজ্ঞার আবার কোনও ভেদ নাই, তবে প্রভেদ কেবল

আধার অনুযায়ী বিকাশের মাত্রাতেই। যেখানেই প্রজ্ঞার বিকাশ, জীবনীশক্তির ক্রিয়া অথবা অন্য কোনও প্রকার শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় সেখানেই আত্মার প্রকাশ আছে ইহা বুঝিতে হইবে। প্রজ্ঞা ব্যতিরেকে কোনপ্রকার জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। প্রথমে 'আমি আছি' এইপ্রকার অস্তিত্বের জ্ঞান না থাকিলে কাহারও অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না। বুদ্ধির মলিনতাবশতঃ আমরা আমাদের আত্মার যথার্থ স্বরূপকে জানিতে না পারিলেও প্রজ্ঞার বিকাশ কিন্তু আমাদের ভিতর থাকিবেই। বেদান্তদর্শন বলে যে, যদি আমরা এই পরিদৃশ্যমান স্থূল জগৎকে অনবরত বিশ্লেষণ করিয়া ইহার কারণকে অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে আমরা পরিশেষে দুইটি মূলতত্ত্বে উপস্থিত হইতে পারিব : তাহাদের একটি 'প্রজ্ঞা' এবং অপরটি 'প্রাণ'। এই প্রাণ ও প্রজ্ঞা বিশুদ্ধ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং সেই বিরাটপুরুষ ব্রহ্মই সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির ক্রিয়ার আধার ও উৎপত্তি স্থান।[১]

১। প্রকৃতপক্ষে এই ব্রহ্ম কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম নন, কেননা নির্গুণ ব্রহ্মে কোনরূপ মায়া, সৃষ্টি বা দ্বিতীয়ের কল্পনা হইতে পারে না।

প্রজাপতি সেজন্য ইন্দ্রকে বলিলেন: "আত্মাই নিখিল বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্যবস্তু।" ঠিক ঠিক উপলব্ধি বা জ্ঞান না হইলে আমরা আমাদের ব্যষ্টিস্বরূপ জীবাত্মাকে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিতে পারি না, কারণ এই নিখিল বিশ্বে এক আত্মাই সচ্চিদানন্দ সমুদ্ররূপে বিরাজমান এবং ইহাকেই ঈশ্বর, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ইত্যাদি বিচিত্র নামে অভিহিত করা হয়। এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যখন আমাদের পাঞ্চভৌতিক শরীরের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হন তখন ব্যষ্টিভাবে উহা আমাদের ব্যক্তিগত আত্মা বা 'জীবাত্মা' বলিয়া অভিহিত হন এবং এই আত্মাই আমাদের প্রজ্ঞা, বুদ্ধি এবং যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়ার মূলে বর্ত্তমান।

বাসনাসমূহ আমাদের মানসিক ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন আকার ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। যদি সর্ব্ববিধ ক্রিয়ার মূলে

যেখানেই দ্বিতীয়ের বা উৎপত্তির কল্পনা হইবে সেখানেই বুঝিতে হইবে তিনি গুণযুক্ত—মায়াকে অবলম্বন করিয়া বিশিষ্ট হইয়াছেন। প্রাণ হিরণ্যগর্ভ এবং প্রজ্ঞা ঈশ্বর বা অব্যক্ত। সুতরাং প্রাণ ও প্রজ্ঞার অধিষ্ঠানরূপে শুদ্ধব্রহ্ম কল্পিত হইলেও যেখানে উৎপত্তি বা সৃষ্টির কথা বুঝিতে হইবে সেখানে শবল মায়াবিশিষ্ট (মায়োপহিত ব্রহ্মই হইবেন—শুদ্ধ তুরীয় ব্রহ্ম নন, তবে শুদ্ধ ব্রহ্ম উপলক্ষিত হইবেন মাত্র।

প্রজ্ঞা অর্থাৎ 'অহং'-জ্ঞান না থাকিত তাহা হইলে বাসনাগুলি আমাদের অন্তরে উদিত হইতে পারিত না। এমন কি তাহাদের অস্তিত্বও থাকিত না। যাঁহার আত্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে তিনি এই জীবদ্দশায়ই সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিয়াও কেবল আনন্দ সত্তায় অবস্থিত থাকিতে পারেন এবং অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পতিত হইলে কখনও উত্তেজিত বা বিচলিত হন না। পরিদৃশ্যমান জাগতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে জীবন্মুক্ত আত্মজ্ঞানী পুরুষ কখনও বিক্ষুব্ধ হন না। যেমন শকটে অশ্ব সংযোজিত হইলে উহা চলিতে থাকে সেইরূপ প্রজ্ঞাযুক্ত জীবও দেহরূপ রথে সংযোজিত হইয়া প্রাণ ও প্রজ্ঞারূপ শক্তি দ্বারা যাবতীয় কার্য্য করিতেছেন। অথবা এই দেহটিকে যদি আমরা একটি মোটর গাড়ীর সহিত তুলনা করি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব মোটর গাড়িটী যেমন বিদ্যুতাধার যন্ত্র (dynamo) হইতে উদ্ভূত তড়িৎশক্তির বলে চলিয়া থাকে সেইরূপ আত্মা হইতে প্রেরিত প্রাণশক্তির দ্বারা এই দেহ সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে। যদি আত্মা এই ইন্দ্রিয়গুলিতে সংযুক্ত না থাকেন তাহা হইলে চক্ষু কিছুই দর্শন করিবে না, কর্ণ কিছুই শ্রবণ করিবে না, নাসিকা কিছুই আঘ্রাণ করিবে না, জিহ্বা কিছুই আস্বাদন করিবে না এবং হস্তপদাদিও কোনই কার্য্য করিবে না।

এজন্য ইন্দ্রকে প্রজাপতি আরও বলিলেন[১]: "চক্ষু-রূপ ইন্দ্রিয়টি কেবল একটি যন্ত্র মাত্র প্রকৃত দ্রষ্টা চক্ষুর তারকার পশ্চাতে অবস্থান করেন। এই দ্রষ্টা ও যিনি দৃষ্ট-বস্তুর জ্ঞাতা একমাত্র তিনিই আত্মা। নাসিকাদ্বয়ও ঐরূপ যন্ত্র মাত্র; আঘ্রাণকর্ত্তাও আত্মা ও জীবের প্রকৃত স্বরূপ। জিহ্বা শুধু আস্বাদন ও বাক্শক্তির যন্ত্র, কিন্তু যাহা বলা যায় তাহা যিনি উচ্চারণ করাইতেছেন এবং তাহার বিষয় যিনি জানিতেছেন তিনিই অন্তরস্থিত চৈতন্যময় পুরুষ বা আত্মা। কর্ণেন্দ্রিয় শ্রবণশক্তির যন্ত্র মাত্র, কিন্তু শ্রবণকর্ত্তা হইতেছেন আত্মা।"[১] "যিনি চিন্তা করিয়া থাকেন তিনিই আত্মা এবং মন তাঁহার আধ্যাত্মিক চক্ষুস্বরূপ। এই মনশ্চক্ষু দ্বারাই আত্মা যাবতীয় প্রিয় বস্তুকে দেখেন এবং আনন্দ উপভোগ করেন। জীবের প্রকৃত স্বরূপ আত্মা মানসিক ক্রিয়া-

১। "অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণ্ণং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ
পুরুষো দর্শনায় চক্ষুরথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি
স আত্মা গন্ধায় ঘ্রাণমথ যো বেদেদমভিব্যাহরাণীতি
স আত্মাঽভিব্যাহারায় বাগথ যো বেদেদং শৃণবানীতি
স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রম্॥"—ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮।১২।৪

সমূহেরও জ্ঞাতা এবং মন, বুদ্ধি ও চিত্ত তাঁহার যন্ত্র মাত্র।”[২]

স্বর্গে বা ব্রহ্মলোকে যে সমস্ত দেবতাগণ বাস করেন তাঁহারা এই আত্মার উপাসনা ও ধ্যান করিয়া থাকেন। সেজন্য সমস্ত পৃথিবী ও স্বর্গাদি লোক দেবতাদের হস্তগত এবং সমস্ত কার্য্য তাঁহাদের আয়ত্তাধীন। যিনি এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহার কোন বিষয়ই সেই সুরলোকবাসী দেবতাদের ন্যায় করায়ত্ত হইতে বাকী থাকে না। তিনিও দেবতাদিগের ন্যায় ত্রিজগতের অধিপতি হন। তাঁহার কোন বাসনাই অপূর্ণ থাকে না এবং এমন কোনও বাসনা নাই যাহা তাঁহার অপরিপূর্ণ থাকিতে পারে। তিনি বাহ্য জগৎ ও সংসার হইতে কোনপ্রকার সুখলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতাই তাঁহার মধ্যে থাকে। এক কথায় তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ ও আনন্দময় সত্তায় বিরাজ করেন।[৩] এইরূপে প্রজাপতি

২। “অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা, মনোহস্য দৈবং চক্ষুঃ, স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে ॥”

—ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮।১২।৫

৩। “য এতে ব্রহ্মলোকে তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে তস্মাৎ তেষাং সর্বে চ লোকা আত্তাঃ সর্বে চ কামাঃ স সর্বাংশ্চ

জীবের প্রকৃত স্বরূপ এবং আত্মার গূঢ়তত্ত্ব ইন্দ্রের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং পবিত্রচেতা, আগ্রহবান্ ও উপযুক্ত শিষ্য ইন্দ্রও গুরুর আশীর্ব্বাদে প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, ইন্দ্র একশত এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া তাঁহার আচার্য্য প্রজাপতির সেবা করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মজ্ঞান লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে। অসাধারণ ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, আগ্রহ এবং অপ্রতিহত ইচ্ছাই আত্মজ্ঞান লাভের সোপানস্বরূপ।

ইন্দ্র পরমানন্দ লাভ করিয়া অবশেষে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গুরুদেবের চরণ বন্দনা করিলেন এবং নিজ আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আত্মজ্ঞান দেবতাগণকেও দান করিলেন। দেবতারাও ইন্দ্রের উপদেশ পালন করিয়া তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া সমস্ত জগতের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এইরূপেই আত্মজ্ঞানের শক্তি ও মহিমা ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে।

লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য জানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ প্রজাপতিরুবাচ ॥"—ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮।১২।৬

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

গুরু ও শিষ্য আমাদের উভয়কে পরমাত্মা রক্ষা ও পালন করুন। আত্মতত্ত্বের জ্ঞানরূপ অমৃতের দ্বারা আমাদের পরিপুষ্টি সাধিত হউক। গুরু যেন আমাদিগকে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদান করেন। আমাদের শাস্ত্র-অধ্যয়ন যেন পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকারে পরিণতি লাভ করে। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যেন কোনও বিদ্বেষ না থাকে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পঞ্চম অধ্যায়

আত্মসাক্ষাৎকার

বৈদিকযুগে কোন আত্মজ্ঞান অন্বেষণকারী ব্যক্তি জীবনের সমুদয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াও দেখিলেন যে, তাঁহার মনে শান্তি আসিতেছে না। তিনি সমস্ত দেবতার পূজা ও সেবাতে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন; কিন্তু কী আশ্চর্য্য, তথাপি তাঁহার তো আত্মজ্ঞান লাভ হইল না! জীবনের অধিকাংশ সময় ঈশ্বরের আরাধনা করিয়াও তিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। সুতরাং যখন তিনি দেখিলেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসকল ও পার্থিব সম্বন্ধের দ্বারা শান্তি ও জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব এবং এই পরিদৃশ্যমান্ বাহ্য জগতের সমস্ত বস্তুই অনিত্য তখন তিনি পার্থিব ভোগসুখাদিতে বীতস্পৃহ হইলেন এবং জাগতিক সমস্ত পদার্থের উপর আসক্তি ত্যাগ করিলেন।

তাহার পর তিনি শাস্ত্র-অধ্যয়নের কার্য্যও ত্যাগ করিলেন, কারণ তিনি বুঝিয়া দেখিলেন যে, শাস্ত্রপাঠে আত্মজ্ঞান কিম্বা অবিচ্ছিন্ন সুখ লাভ করা যায় না। ধর্ম্মপুস্তক ও

শাস্ত্রসমূহ উচ্চ হইতে উচ্চতর ব্যবহারিক সত্যসমূহের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় মাত্র। কিন্তু উহাদের দ্বারা মানুষ সর্ব্বোচ্চ সত্যস্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা মনে করেন শুধু ধর্ম্মগ্রন্থ ও শাস্ত্র-অধ্যয়নের দ্বারাই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করা যায় তাঁহারা ভ্রান্ত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ভগবৎপ্রেম, মুক্তির অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে মাত্র; কিন্তু যেমন পঞ্জিকার মধ্যে সমস্ত বৎসরের বারিবর্ষণের পরিমাণ লিখিত থাকিলেও উহাকে নিংড়াইলে একবিন্দুও জল পাওয়া যায় না সেইরূপ সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থকে মন্থন করিলেও আধ্যাত্মিক সত্যসকলের বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি হয় না। সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত তত্ত্বের অর্থ জানিতে হইলে প্রথমে উহাতে বর্ণিত সত্যের উপলব্ধি করিতে হইবে।

এই কারণেই পূর্ব্বকথিত সেই ব্যক্তি শাস্ত্র-অধ্যয়ন প্রভৃতি অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে কোন এক আত্মজ্ঞানবান্ গুরুর নিকট শ্রদ্ধাবনত চিত্তে গমন করিলেন। এক্ষণে তাঁহার আর অন্য কোনও প্রকার বাসনা ছিল না, এমন কি তিনি স্বর্গে যাইতেও চাহেন না, আত্মজ্ঞান লাভ করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহা ভিন্ন তিনি অন্য কিছুতেই সন্তুষ্ট বা সুখী

হইবেন না। যে দিব্যজ্ঞানরূপ অমৃতধারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের মধ্যে অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হয় সেই অমৃতধারা আস্বাদন. করিতে এখন তিনি উৎসুক। এই স্থূল নশ্বর দেহটিই জীবের সমগ্র সত্তা নয় এবং ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রনকারী মনও প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং তাহারা কেহই অবিকারী ও অপরিণামী আত্মা হইতে পারে না। শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের দ্বারা ইহা অবগত হইলেও তবুও তাঁহার আত্মজ্ঞান পিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই। এক্ষণে সেই অপরিবর্ত্তনশীল ও নির্ব্বিশেষ পরমসত্যের —আত্মার আত্মা এবং সমগ্র বিশ্বচরাচরের একমাত্র শাস্তা ও নিয়ন্তার অনুসন্ধানে তিনি ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এজন্য একান্ত ভক্তির সহিত ব্রহ্মবিদ্ সদ্‌গুরুর পদপ্রান্তে প্রণত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: "ভগবন্, কে এই মনকে শাসন করিতেছে? কোন্ শক্তির প্রেরণায় মন আপনার যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে? কাহার শক্তি আমাদের দেহের মধ্যে অবস্থিত প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়শক্তিগুলিকে নিয়মিতভাবে চালাইতেছে? কি কারণে আমরা এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই এবং এই কর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণই বা কি? কাহার ইচ্ছায় সমস্ত মানব বাক্য উচ্চারণে সমর্থ হইতেছে? এই দৃশ্যসমূহের দ্রষ্টাই বা কে? কোন্ শক্তি চক্ষু, কর্ণ

এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজ নিজ কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছে ?"[১]

এই প্রশ্নগুলি অবলম্বন করিয়া কেনোপনিষৎ আরম্ভ হইয়াছে। লিখিবার কলাকৌশল উদ্ভাবিত ও প্রচলিত হইবার বহুশতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবাসীদের মধ্যে বহু পুরুষ ধরিয়া মুখে মুখে এই উপনিষদের শিক্ষা প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই উপনিষৎ কত সুপ্রাচীন এবং ইহার উপদেশাবলীও কত মহান্! সেই প্রাচীন যুগের প্রশ্নগুলির ভিতরে ভাবের গাম্ভীর্য্য ও গভীরতা একবার ভাবিয়া দেখুন। আমরা জানি যে, আমাদের মন সর্ব্বদা চঞ্চল; এই মুহূর্ত্তে নূতন ভাব নূতন চিন্তা মনে উদিত হইতেছে, আবার ঠিক তাহার পরমুহূর্ত্তেই উহা কোথায় লীন হইতেছে। মন অবিরত একস্থান হইতে অন্যস্থানে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ইহা কখনও ভারতবর্ষে, কখনও ইংলাণ্ডে, আবার কখনও চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র এবং অন্যান্য গ্রহমণ্ডলে

১। "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ, কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি, চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥"
—কেনোপনিষৎ ১।১

য়া চলিতেছে। এইজন্যই শিষ্যটি গুরুর নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন: "কাহার দ্বারা নিয়োজিত হইয়া মন অবিরাম চঞ্চলভাবে ছুটিয়া বেড়ায়?" ইহার উত্তরে আচার্য্যদেব বলিলেন: "যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, ইন্দ্রিয়যন্ত্রের সমস্ত কার্য্যের নিয়ন্তা এবং যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তুর দর্শনকর্তা, তিনিই উহা করিয়া থাকেন।[২]" এই উত্তরটির অর্থ কি তাহা এখানে বিশদভাবে দেখা যাক্। 'শ্রবণ করা'—এই বাক্যের দ্বারা আমরা কি বুঝিয়া থাকি? যে শক্তির দ্বারা এই ভাবটি আমাদের অন্তরে জাগরিত হয় তাহাকেই শব্দের দ্বারা বাহিত শ্রবণকার্য্য বুঝায়, অথবা ইন্দ্রিয়ের যে শক্তি শব্দকম্পনকে পরিচিত করায়, অর্থাৎ কম্পনটির অস্তিত্ব জ্ঞাপন করায় তাহাকেই শ্রবণ-ব্যাপার বলে। সুতরাং যাঁহার সাহায্য ব্যতীত কোনও শব্দই শ্রবণ করা যায় না সেই শ্রবণশক্তির উন্মেষকারী ও উদ্ভাসককে শ্রোত্রের শ্রোত্র বুঝায়। আচার্য্যের উত্তরের তাৎপর্য্য বা ভাবার্থ এই যে, যিনি মনের প্রেরণা ও কার্য্যের

২। "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ।"
—কেনোপনিষৎ ১।১

নিয়ন্ত্রণকারী তিনিই শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও বাক্‌শক্তির উদ্ভাসক বা প্রকাশক এবং তিনিই আমাদের ইন্দ্রিয়যন্ত্রাদির সমস্ত কার্য্যের জ্ঞাতা।

চক্ষুর চক্ষুস্বরূপ—ইহার অর্থও ঐ প্রকার। ইন্দ্রিয়ের যে কার্য্যের দ্বারা দ্রষ্টব্য বস্তু প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ আমাদের নিকট বস্তুটি পরিচিতরূপে প্রকাশিত হয় তাহাকেই দর্শন-ক্রিয়ার ব্যাপার বলে। জ্ঞান বা বুদ্ধি উৎপাদন করিতে দর্শনেন্দ্রিয়ের কোনও ক্ষমতা নাই। দর্শনকারী ব্যক্তি যতক্ষণ প্রজ্ঞাচক্ষুসম্পন্ন থাকেন, অর্থাৎ যতক্ষণ তাঁহার 'অহং পশ্যামি' বা 'আমি দর্শন করিতেছি' এইরূপ জ্ঞানটি থাকে ততক্ষণই দর্শনশক্তিটি তাঁহাতে জাগ্রত থাকে। দর্শনেন্দ্রিয়ের যন্ত্রগুলি যথা চক্ষু, অক্ষিগোলকের ঝিল্লি (retina), চক্ষুর সমস্ত স্নায়ু, মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ (brain-cells) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য বস্তু বা কোনও বর্ণসম্বন্ধে জ্ঞান উৎপাদন করিতে একেবারেই সক্ষম নয়। কোনও মানবের মৃত দেহে পূর্ব্বোক্ত দৈহিক সংস্থানগুলি অবিকৃত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঐ দেহ কোনও বর্ণ বা কোনও দৃশ্য অনুভব করিতে সক্ষম হইবে না। কেবলমাত্র জড় দেহটি স্বাধীনভাবে কোনও বাহ্যবস্তু দেখিতে বা তাহা অনুভব করিতে পারে না। এইরূপে

আমাদের অনুভূতিগুলির বিশ্লেষণ ও বিচারের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়যন্ত্রের জ্ঞান শক্তিবিহীন বা অচেতন। চৈতন্যময় আত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় ক্রিয়ার প্রকাশক; তিনিই দর্শনকর্ত্তা, শ্রবণ-কর্ত্তা ও অনুভবের কর্ত্তা। আত্মাই আমাদের অন্তরের মধ্যে চিন্তারাজির উৎপাদক ও কর্ত্তারূপে বর্ত্তমান। সেই জ্ঞান ও চৈতন্যের ঘনীভূত প্রকাশরূপ আত্মাই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ও অনুভূতির মূলস্বরূপ এবং মন ও ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যনিয়ামক। যখনই আমরা প্রজ্ঞা অথবা আত্মচৈতন্যের কারণকে উপলব্ধি করিতে পারিব তখনই মনের নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিকে আমরা বুঝিতে সক্ষম হইব।

স্পন্দন অথবা কম্পনের ফলে সূক্ষ্মতর অবস্থায় পরিণত পরমাণুকেই বেদান্তে 'মন' বলিয়া অভিহিত করা হয়। মনের এই উপাদানের কম্পন (vibration) হইতেই সর্ব্ব-প্রকার বোধশক্তি ও অনুভব করার ক্রিয়া উদ্ভব হইয়া থাকে এবং যে সকল বস্তু স্থূল জড়-পরমাণুর কম্পনের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না ইহা তাহাদিগকে প্রকটিত করে। সত্ত্বগুণসম্পন্ন অতিসূক্ষ্ম পরমাণুরাশির কম্পনই মনের যাবতীয় বৃত্তি (function)। কিন্তু মনের ঐ উপাদানের কম্পনের দ্বারাও জ্ঞান বা প্রজ্ঞা (চৈতন্য) উৎপন্ন হয় না। বৃত্তি স্বভাবতঃই জ্ঞানশক্তিবিহীন বা অচেতন।

একখণ্ড লৌহকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে রাখিলে উহা যেরূপ ঐ অগ্নির মতই জ্বলন্ত লোহিতবর্ণ ও তাহার দাহিকা-শক্তিবিশিষ্ট হয় সেরূপ মন পদার্থটিও চৈতন্যময় আত্মার সংস্পর্শে আসিলে তাহা চেতনধর্ম্মী বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। প্রজ্ঞানঘন আত্মা যেন চুম্বকের মত মনরূপী লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। যখন একখণ্ড লৌহকে চুম্বকের নিকট রাখা যায় তখন লৌহখণ্ডটি তাহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নড়িতে থাকে; কিন্তু বাস্তবিক লৌহের নিজের উক্ত প্রকারে নড়িবার ক্ষমতা নাই; লৌহখণ্ড চুম্বকের নিকট অবস্থান করিলে অথবা উহার সংস্পর্শে আসিলে তাহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই লৌহের গতিশীলতা দেখাইয়া থাকে। চুম্বকের সান্নিধ্যই যেমন লৌহখণ্ডটির মধ্যে গতিশীলতা আনয়ন করে, আত্মার সান্নিধ্যই সেইপ্রকারে মনরূপ বস্তুটিকে ক্রিয়াশীল করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, আত্মা মনোরাজ্যের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে; কারণ, তিনি দেশ ও কালের সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধের অতীত।

আচার্য্যদেব বলিতে লাগিলেন: এই আত্মাকে বিদিত হইয়া তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীব্যক্তিরা পার্থিব বাসনাদি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের অধিষ্ঠান সেই আত্মাকে

জ্ঞাত হইয়াছেন তাঁহারাই অমৃতত্ব লাভ করেন। কিন্তু যাঁহারা আত্মাকে জানিতে পারেন নাই, তাঁহারা স্থূল দেহে এবং ইন্দ্রিয়াদিতেই আসক্ত হইয়া থাকেন এবং তাহার জন্য তাঁহাদিগকে বারবার জন্ম-মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইতে হয়। আমাদের যথার্থ স্বরূপ বা আত্মাকে জানিতে পারিলে আমরা অমৃতত্ব লাভ করি—ইহা আত্মজ্ঞানের বিভিন্ন ফলের মধ্যে অন্যতম একটি ফল। যদিও বেদান্তদর্শনের মতে আত্মার মৃত্যু নাই এবং অমরত্বই আমাদের জন্মগত অধিকার তথাপি যতদিন না আত্মাকে অবিনাশী বলিয়া আমরা উপলব্ধি করিতে পারি ততদিন আমাদের ঐ অমৃতত্ব লাভ হয় না। "আমরা বিনাশশীল"—যে পর্য্যন্ত এই সংস্কার আমাদের মধ্যে আছে সে পর্য্যন্ত আমাদের মৃত্যু-ভয় থাকিবে। আত্মার অমরত্ব উপলব্ধি করিলেই সমস্ত ভয় চলিয়া যায়। অজ্ঞানতার জন্যই আমাদের মৃত্যু-ভয় উপস্থিত হয় এবং সেজন্যই আমরা যে অমৃতের সন্তান ও মৃত্যুর অতীত—এই কথা ভুলিয়া যাই, আর সঙ্গে সঙ্গে 'আমরা দেহ ছাড়া আর কিছু নহি' এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া মৃত্যুর অধীন হইয়া পড়ি। এইরূপ বিনাশশীল ও নশ্বর স্থূল দেহটির সহিত একীভূত হইয়া অথবা দেহের সহিত নিজেকে এক

ভাবিয়া আমরা মৃত্যুকে ভয় করিতে থাকি এবং দুঃখে ও নৈরাশ্যে কাতর হইয়া পড়ি। দেহ নশ্বর ও তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। অতএব আত্মাকে সেই নশ্বর দেহের সহিত এক বলিয়া বোধ করিলে কিরূপে মৃত্যু-ভয় হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারি? এই জড় দেহটি আত্মার ক্ষণিক আবাসস্থল বা আধার—এই ভাবটি যিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাঁহাকে আর মৃত্যু-ভয়ে কাতর হইতে হয় না। যিনি এই মহান্ সত্যটি যথাযথভাবে জানিয়াছেন যে, আত্মাই কতকগুলি বাসনা ও উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য এই দেহযন্ত্রটি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন তিনিই ভয়কে অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন। এই কারণে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে: "যাঁহারা আপনাদের যথার্থ স্বরূপের বা আত্মার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকেই জ্ঞানী বলা যায় এবং দেহটি ধ্বংস হইলে তাঁহারা জন্ম-মৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া চলিয়া যান।"[৩] এই আপেক্ষিক জগতে ইহাই একমাত্র অভীষ্ট বস্তু।

একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি। এখন আমরা মনে করিতেছি যে, বিষয়-সম্পত্তির ভোগ, ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ, বাসনা-

৩। "—অতিমুচ্য ধীরাঃ,
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥"—কেনোপনিষৎ ১।২

চরিতার্থ ও ইন্দ্রিয়-বিলাসই এই জীবনের চরমলক্ষ্য। কিন্তু এমন একদিন আসিবে যখন আমরা বুঝিতে পারিব যে, এই বিষয়-ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্তই ক্ষণস্থায়ী; জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহা অপেক্ষা আরও উচ্চতর। অধিকতর স্থায়ী জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন; কারণ মানব-জীবনের উদ্দেশ্য যথার্থভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে কিনা তাহা বুঝিবার সঠিক আদর্শ এই পৃথিবীতে অতি অল্প লোকেই প্রাপ্ত হয়। আমাদের প্রত্যেককেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যটি কি তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে। সেই আদর্শ আত্মজ্ঞান লাভ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আত্মজ্ঞান হইতেই শাশ্বতী মুক্তি লাভ হয়। এই আত্মজ্ঞানের দ্বারাই আমরা সমস্ত কাম্য বস্তু বা বিষয়কে প্রাপ্ত হইতে পারি। মানবের প্রকৃত স্বরূপ বা আত্মার জ্ঞানলাভ অপেক্ষা এই জগতে শ্রেষ্ঠতর বস্তু আর নাই। বর্ত্তমানে আমাদের অধিকারে যে পরিমাণ জ্ঞান আছে তাহা অসম্পূর্ণ এবং ইহা সেই সর্ব্বজ্ঞ শুদ্ধস্বভাব আত্মার আংশিক প্রকাশমাত্র। আমাদের বুদ্ধিতে আত্মা দর্পণের ছায়ার ন্যায় প্রতিবিম্বিত হয়। এই বুদ্ধি সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ এবং সেইজন্য ইহাতে আত্মার প্রতিফলনও অসম্পূর্ণতার দোষযুক্ত। কিন্তু যখনই সর্ব্বপ্রকার মলিনতা ও অসম্পূর্ণতা চলিয়া যাওয়ার ফলে বুদ্ধি নির্ম্মল হয়

তখনই যথার্থ জ্ঞান আমাদের অন্তরের মধ্যে সমুদিত হয়। একটি দর্পণ ধূলিসমাচ্ছন্ন হইলে তাহাতে যেরূপ সূর্য্যের আলোক প্রতিফলিত হয় না, বুদ্ধিরূপ দর্পণও সেইরূপ সংসার-বাসনারূপ ধূলিজালে মলিন ও সমাবৃত হইলে দিব্যজ্ঞানের সূর্য্যরূপ আত্মার আলোকরশ্মি তাহাতে প্রতিভাসিত হয় না। চিত্তকে শুদ্ধ, বুদ্ধিকে নির্ম্মল এবং সেই পরমসত্য সম্বন্ধে শিক্ষা করিতে হইলে আমাদের একজন তত্ত্বজ্ঞ ও সিদ্ধগুরুর সাহায্য প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা এক ভিন্ন বহু নহে এবং যে জ্ঞান আমাদের আছে যখন তাহার দ্বারা আমরা জন্ম-মৃত্যুর অতীত আত্মাকে উপলব্ধি করিব তখনই আমাদের এই ক্ষুদ্র জাগতিক জ্ঞানও দিব্যজ্ঞানের অসীমতা লাভ করিবে। অতএব যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহারা এই জীবনেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

যিনি মনের নিয়ন্তা, দৃশ্যের দ্রষ্টা এবং যাঁহাকে জানিয়া লোকে অমৃতত্ব লাভ করে ঐ শিষ্যটি সেই আত্মার দর্শন লাভ করিতে অভিলাষী হইলেন। তাহাতে তাঁহার গুরুদেব বলিলেন: "দর্শনশক্তি'র তো আত্মাকে প্রকাশ করিবার কোনও ক্ষমতা নাই।"[৪]

৪। "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি *।"—কেন ১।৩

তখন শিষ্যটি চিন্তা করিয়া বলিলেন: "আচ্ছা, যদি চক্ষুর আত্মদর্শন করাইবার ক্ষমতা না থাকে, অন্ততঃ আত্মা কিরূপ, তাহার বর্ণনা তো করা যাইতে পারে?" আচার্য্যদেব উত্তর করিলেন: "বাক্য তাঁহার বিষয় বর্ণনা করিতে অক্ষম; মনও সেখানে অর্থাৎ আত্মার রাজ্যে যাইতে পারে না। যখন আমরা তাঁহাকে মন ও বুদ্ধির সহযোগে জানিতে পারি না তখন কী প্রকারে তাঁহার বিষয় বাক্যের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর হইতে পারে?"[৫] আত্মাই যাবতীয় চিন্তার কর্ত্তা। চিন্তা-রাজ্যের অতীত যে আত্মা তাঁহারই দ্বারা পরিচালিত হইলে মন চিন্তা করিতে পারে। চিন্তা করার কার্য্যটি হইতেই প্রজ্ঞার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায় এবং প্রজ্ঞা না থাকিলে কাহারও অন্তরে কোন প্রকার চিন্তারই উদয় হইতে পারে না। সুতরাং যাহা সর্ব্বপ্রকার চিন্তার বহিঃসীমায় ও অতীত প্রদেশে আছে তাহাকে মন ও বুদ্ধি কিছুতেই ধরিতে পারে না।[৬] যখন মনই এই আত্মার বিষয় চিন্তা করিতে পারে না তখন চক্ষু কী প্রকারে এই আত্মাকে দেখিতে পাইবে?

৫। "যন্মনসা ন মনুতে * ।"—কেন ১।৬

৬। "ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।"—কেন ১।৩

যাঁহার সংস্পর্শে আসিবার পরে দৃষ্টিশক্তির দর্শন করাইবার ক্ষমতা প্রকাশ পায় তাঁহাকে দৃষ্টিশক্তি কিরূপে দেখাইতে পারিবে? ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারা যায় না। আচার্য্যদেব বলিলেন: "আত্মা জ্ঞাত বস্তু হইতে বহু দূরে এবং অজ্ঞাত বস্তুরও বহু উর্দ্ধে—এই উপদেশ আমরা সেই প্রাচীন আচার্য্যবৃন্দের নিকট শ্রবণ করিয়াছি।"[৭] অতি প্রাচীনকাল হইতে সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ বলিয়া আসিতেছেন যে, আমাদের যথার্থ স্বরূপ বা আত্মা যেমন জ্ঞাত বা জ্ঞেয় নহেন সেইরূপ আত্মা আবার অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয়ও নহেন। সাধারণতঃ আমরা ব্যবহারিক জগতে 'এই বস্তুটি জানি' অথবা 'এই পুস্তক সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে' এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকি; কিন্তু এইপ্রকার জ্ঞানের মতন আত্মা সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান হইতে পারে না। অর্থাৎ আত্মা এইরূপে জ্ঞাত হন না অথবা আত্মা উক্ত পুস্তকটির মতন জ্ঞাতব্য বিষয়ও হইতে পারেন না।

এক্ষণে এই বিষয়টি অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুটভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। যখন আমরা বলি যে 'অমুক

৭। "অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্‌ব্যাচচক্ষিরে॥"—কেন ১।৪

বস্তুটি আমি জানি' তখন ঐ বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের বুদ্ধি দ্বারা প্রকাশিত আপেক্ষিক জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে, অর্থাৎ আমার ঐ বুদ্ধির সাহায্যে আমি ঐ বস্তুটিকে জানিতে পারিলাম। আবার ইহাও হইতে পারে যে, যে-বুদ্ধি দিয়া আমি পূর্বে ঐ প্রকার বস্তু জানিতে পারিয়াছিলাম উহা সেই একই প্রকার বস্তু বলিয়াই এখনও সেই বুদ্ধি দিয়া উহাকে আবার জানিতে পারিলাম। এইরূপ জ্ঞানকেই 'আপেক্ষিক জ্ঞান' বলে। আবার যখন বলি যে 'অমুক বস্তুটি জানি না' তখনও ঐ না-জানিতে পারা-রূপ জ্ঞানটিও বুদ্ধির আপেক্ষিক জ্ঞান। তাহার পর আবার যে সমস্ত বস্তুর ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ আছে বা যাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাদেরই আমরা বুদ্ধির দ্বারা জানিতে পারি। এই বুদ্ধি কোন-না-কোনও প্রকারে ইন্দ্রিয়ের শক্তিগুলির অধীন; সুতরাং ইহার ক্ষেত্রও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কারণ ইন্দ্রিয়গুলিকে যদি একটি বৃত্তের মধ্যে অধিষ্ঠিত বলিয়া মনে করি, উহাদের শক্তিগুলি যদি ঐ বৃত্তের পরিধি মনে করি এবং উহাদের শক্তি-গুলি যদি ঐ বৃত্তের পরিধি অতিক্রম করিয়া না যাইতে পারে তাহা হইলে একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বৃত্তটি অতি ক্ষুদ্র; কারণ

ইন্দ্রিয়-শক্তির সীমা অতিশয় ক্ষুদ্র। দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা বুঝিয়া দেখা যাউক। আমরা কর্ণের দ্বারা শব্দ শ্রবণ করি। যদি বায়ুর কম্পনটি কোন একটি নির্দ্দিষ্ট মাত্রার অন্তর্গত থাকে তবে শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে। আর যদি ঐ কম্পন নির্দ্দিষ্ট মাত্রার বেশী বা কম হয় তাহা হইলে কোন শব্দই শুনিতে পাওয়া যাইবে না। এমন কি যদি ভীষণ একটি শব্দ হয় তাহা হইলেও মাত্র তুইটির মধ্যে উক্ত শব্দের কম্পনের সংখ্যা না থাকিলে আমাদের কর্ণ ঐ শব্দ শ্রবণ করিবে না। চক্ষু সম্বন্ধেও এইরূপ হইয়া থাকে। কোনও বস্তু বিশেষ তুইটি সীমার মধ্যে অবস্থান করিলেই উহাকে দর্শন করিতে পারা যায়। তাহা হইলে এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের বুদ্ধিটি ইন্দ্রিয়শক্তিগুলির অধীন হইয়া কিভাবে সীমাবদ্ধ; সুতরাং ইহা বলিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা গৌণ জ্ঞান। ইহা আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না। এইজন্যই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে: "আত্মা জ্ঞাত বস্তু হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন।" আবার যখন আমরা বলি যে, 'এই বস্তুটি জানি না' তখন ঐ কথার দ্বারা আমরা এই বুঝিতে পারি আমাদের ঐ বস্তু

সম্বন্ধে অজ্ঞতার জ্ঞানটিই আছে, অর্থাৎ আমরা ঐ বস্তুটিকে বুঝিতে পারি না অথবা বুদ্ধির দ্বারা উহাকে জানিতে পারি না—এই জ্ঞানটিই আমাদের আছে। বুদ্ধির দ্বারা কোন বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবকেই অজ্ঞতা বলে এবং ইহাকেই আমরা গৌণ জ্ঞান বলিয়াছি। ইহা ছাড়া আর এক প্রকার জ্ঞান আছে যে জ্ঞান বুদ্ধি অথবা ইন্দ্রিয়ানুভূতি সাপেক্ষ নহে এবং এই জ্ঞানই যথার্থ আত্মাকে প্রকাশিত করিয়া দেয়। যে অনুভূতির দ্বারা আমাদের এরূপ জ্ঞান হয় যে, 'এই বস্তুটি আমি জানি' সেই জ্ঞানটি যে আত্মা হইতেই আসিয়া থাকে ইহা আমাদের অজ্ঞাত। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, আত্মা জ্ঞাতও নহেন বা অজ্ঞাতও নহেন। কিন্তু এই আত্মা অজ্ঞতা এবং যাবতীয় আপেক্ষিক জ্ঞানের অতীত। "আমাদের পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের নিকট ইহাই শুনিয়াছি।"[১] যদিও এই কেনোপনিষৎ সামবেদের অন্তর্গত এবং অতি প্রাচীন তথাপি যে সমস্ত পূর্ব্ববর্ত্তী সত্যদর্শী ঋষির নিকট হইতে পুরুষানুক্রমে ঐ সত্যের শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে সেই পূর্ব্বতন দিব্যদ্রষ্টা ঋষিদিগকে উল্লেখ

১। "ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে ॥"

—কেনোপনিষৎ ১।৩

করিয়াই আচার্য্যদেব পূর্ব্বোক্ত কথাটি বলিয়াছিলেন। তাহার পর আচার্য্যদেব আবার বলিলেন: "বাক্যের দ্বারা যাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না, বরং যাঁহার সাহায্যেই সমস্ত বাক্য উচ্চারিত হয় তিনিই পরমাত্মা অথবা ব্রহ্ম; সাধারণ লোকে যাঁহার উপাসনা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন।"[২] বস্তুতঃ ঈশ্বরে আমরা যে সমস্ত গুণ আরোপ করি, তাহা তাঁহার যথাযথ গুণ নহে। যেমন আমরা বলি ঈশ্বর সদ্‌গুণসম্পন্ন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি তো কেবল সদ্‌গুণসম্পন্ন নহেন—তিনি ভাল ও মন্দ, শুভাশুভ, দোষ ও গুণ সর্ব্ববিধ প্রবৃত্তি ও দ্বন্দ্বের অতীত। আমরা গুণ ও দোষ উভয়েরই পার্থক্য মনে মনে বিচার করিয়া সদ্‌গুণকে দোষ হইতে পৃথক্ করি এবং তাহার পর ঐ সদ্‌গুণের আকারটিকে মনের মধ্যেই বর্দ্ধিত ও বিকশিত করিয়া উহা অনন্তের উপর আরোপ করি এবং বলিয়া থাকি যে, তিনি যাবতীয় সদ্‌গুণের নিদান। আমরা ভুলিয়া যাই যে, যাঁহাকে আমরা উৎকৃষ্ট বলিতেছি তাঁহাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন কিছু আছে, আবার সেই উৎকৃষ্টতর অপেক্ষা এমন উচ্চতর অবস্থা হইতে পারে যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, আমরা এত

২। "যদ্বাচানাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

—কেনোপনিষৎ ১।৪

ভ্রান্ত যে, ঈশ্বরকে 'উত্তম' বা 'উৎকৃষ্ট' আখ্যা দিয়াই আমরা সন্তুষ্ট হইয়া থাকি। ভাল ও মন্দ এই কথাগুলি আপেক্ষিক এবং সীমাবদ্ধ এবং ঈশ্বরও আপেক্ষিক রাজ্যের অতীত; সুতরাং তিনি আমাদের প্রদত্ত "উৎকৃষ্ট" আখ্যারও অতীত। এইপ্রকারে ইহা দেখান যাইতে পারে যে, যে সমস্ত গুণ বা বিশেষণ আমরা ঈশ্বরে আরোপ করি, শুধু তাহাই বা কেন—যে কোন বাক্যই যাহা আমরা উচ্চারণ করি, তাহাদের প্রত্যেকেরই ভাব ও অর্থ সীমাবদ্ধ। যদি আমরা আরও গভীরভাবে অনুধাবন করি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে, প্রজ্ঞাযুক্ত চিন্তার কর্ত্তা ও বক্তা পশ্চাতে না থাকিলে কোন প্রকার চিন্তাও করা যায় না, অথবা কোন বাক্যও উচ্চারণ করা যায় না। এই প্রজ্ঞা সেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মার আলোক হইতে প্রকাশিত হয়। সুতরাং আত্মাই একমাত্র চিরন্তন সত্য-বস্তু এবং ইহাকে বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। এই আত্মাই বাক্যের উৎপাদক অথচ বাক্যের দ্বারা এই আত্মাকে প্রকাশ করা যায় না।

ভক্তিমার্গের সাধকগণ যে সগুণ ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিই কি আত্মা? অনেকে বলেন এক মহান্ পুরুষ আমাদের জগতের বহিঃপ্রদেশে স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহারই ইচ্ছা ও আদেশক্রমে আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়াদি পরিচালিত হইতেছে; সেই

বিরাট্ পুরুষই কি আত্মা? অথবা যাঁহাকে আমরা 'জগৎপিতা' বা 'আল্লা' ইত্যাদি নামে ভক্তি-নিবেদনের দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকি তিনিই কি আত্মা? যাঁহাকে আমরা 'স্বর্গস্থিত পিতা' বলিয়া থাকি তিনিই কি আত্মা? তাহা হইলে আত্মা কোন্ বস্তু? শিষ্যের মনে উত্থিত উক্ত প্রকার প্রশ্নরাশি বুঝিতে পারিয়া তাঁহার গুরুদেব বলিলেনঃ "লোকে যাঁহার আরাধনা করে, তিনি ব্রহ্ম বা আত্মা নহেন।" নাম-রূপধারী সাকার দেবদেবীর অথবা নিরাকার সগুণ ঈশ্বরের যিনি আরাধনা করেন তিনি সেই নির্ব্বিশেষ সত্যের বা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন না, কারণ তিনি সগুণ ও সাকার ঈশ্বরকেই পূজা করিতেছেন। নাম ও রূপ এই দুইটি প্রাকৃতিক রাজ্যের অন্তর্গত। সুতরাং এই দুইটির বিশেষত্ব ঈশ্বরে আরোপ করিয়া তাঁহাকে আমরা নাম-রূপধারীরূপে কল্পনা করি। এইরূপ কল্পনা মানব-মনের সৃষ্টি। সেইজন্য উহা দোষযুক্ত, অর্থাৎ আমরা আমাদের কল্পনার সাহায্যে ঈশ্বরের একটি সাকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করি এবং তাঁহাতে আমাদের আদর্শ ভাবানুযায়ী বিভিন্ন গুণ আরোপ করিয়া প্রার্থনাদির দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকি। প্রার্থনাগুলি মনোগত ভাববিশিষ্ট বাক্যসমষ্টি মাত্র। আমরা সেই সগুণ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ঐ বাক্যগুলি (প্রার্থনাসমূহ) বিশেষ কোনও ফললাভের জন্য উচ্চারণ

করিয়া থাকি। কিন্তু যাঁহার নিকট আমরা এই সমস্ত প্রার্থনা করি তিনি আমাদের বাক্‌শক্তির নিয়ামক নহেন। যাঁহার সাহায্যে আমাদের বাক্‌শক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় তিনি চৈতন্যস্বরূপ আত্মা। সেই 'আত্মা' এই উপাসিত সগুণ ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ অতীত। বস্তুতঃ নাম-রূপধারী সগুণ ঈশ্বর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নহেন। এই উক্তি আমাদের নিকট আশ্চর্য্যজনক বোধ হইতে পারে। তথাপি আমাদের উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে ঈশ্বরের নাম এবং রূপ আছে এবং যাঁহাকে বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করা যাইতে পারে এবং মনের দ্বারা যাঁহাকে চিন্তা করা যাইতে পারে তিনি কখনই বাক্য ও মনের অগোচর সেই ব্রহ্ম হইতে পারেন না। শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে: "যখন ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইয়াছি বলা যায় তখন তিনি আর ব্রহ্ম নহেন; যাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া থাকি তিনি আমাদের কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহেন।"[১] যাঁহাকে পূজা করা যায় সেই সগুণ দেবতা হইতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সম্পূর্ণ পৃথক্।

যাঁহাকে আবার মনের দ্বারা চিন্তা করিতে পারা যায় তিনিও ব্রহ্ম নহেন। সেজন্য আচার্য্য বলিলেন:

১। "চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিনঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা

"যিনি মনের অগোচর এবং মনের দ্রষ্টা তাঁহাকেই তোমার আত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। কিন্তু লোকে যাঁহার আরাধনা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন।"[২] "চক্ষুর দ্বারা যাঁহাকে দর্শন করিতে পারা যায় না, কিন্তু যাঁহার সাহায্যে চক্ষু দর্শন করিয়া থাকে, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; কিন্তু লোকে যাঁহার উপাসনা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন।"[১] "কর্ণ দ্বারা যাহাকে শ্রবণ করিতে পারা যায় না, বরং কর্ণই যাঁহার দ্বারা শব্দাদি শ্রবণ করে, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; কিন্তু যাঁহাকে লোকে পূজা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন।"[২] "লোকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা যাঁহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, বরং যাঁহার সাহায্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয় আঘ্রাণ করিতে সমর্থ হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; কিন্তু জনসাধারণের দ্বারা যিনি উপাসিত হন তিনি ব্রহ্ম

২। "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥—কেনোপনিষৎ ১।৫

১। "যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"—কেনোপনিষৎ ১।৬

২। "যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥"
—কেনোপনিষৎ ১।৭

নহেন।"[৩] এই শ্লোকগুলির অর্থ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মন এবং ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক আত্মা ও সগুণ ঈশ্বর এক নহেন; কিন্তু আত্মা ও নির্ব্বিশেষ সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম এক।

গুরুদেবের নিকট আত্মা সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিষ্যটি সেই বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়াতীত আত্মা অথবা ব্রহ্মকে ধ্যান করিবার জন্য নির্জ্জন স্থানে চলিয়া গেলেন। তিনি কিছুকাল ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অতিবাহিত করিলেন। এবং আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সাধারণ জ্ঞানরাজ্যে আবার মনকে ফিরাইয়া আনিলেন এবং তাঁহার গুরুদেবের নিকট গমন করিয়া বলিলেন: "আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি ও সেই পরম সত্য উপলব্ধি করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া তাঁহার গুরুদেব বলিলেন: "তুমি যদি মনে কর যে, তুমি আত্মাকে জানিয়াছ তাহা হইলে স্থির জানিও যে, তুমি আত্মার স্বরূপ অতি অল্পই জ্ঞাত হইয়াছ।"[১] যদি তোমার

৩। "যৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

—কেনোপনিষৎ ১।৮

১। "যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি,
নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।"—কেনোপনিষৎ ২।৯।১

বিশ্বাস হইয়া থাকে যে, তুমি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইয়াছ তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তোমাতে ও নিখিল বিশ্বে ওতঃপ্রোতঃ সেই সত্যস্বরূপের অতি সামান্যই তুমি অবগত হইয়াছ। সত্য এক, উহা একের অধিক নহে। এই সত্যকে জানিয়াছ এইরূপ যদি তোমার মনে হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তুমি বুদ্ধির দ্বারা তোমার গৌণ জ্ঞান অবলম্বন করিয়াই এইরূপ বলিয়াছ। ইহা নিশ্চয় জানিও যে, গৌণ জ্ঞানের দ্বারা সেই নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ কখনই প্রকাশ হইতে পারে না। তুমি ব্রহ্মকে বা আত্মাকে জানিয়াছ এই বিশ্বাসকে যদি অন্তরে স্থান দাও তাহা হইলে মনের পরিচালক সেই আত্মাকে তুমি অল্পই জানিয়াছ। আর তুমি যদি এরূপ মনে কর যে, তিনি তোমার দেহের মধ্যে বাস করিতেছেন তাহা হইলে তাঁহার নির্গুণত্ব সম্বন্ধে তুমি কিছুই বুঝিতে পার নাই। আবার তিনি তোমার দেহের বাহিরে অবস্থান করিতেছেন এইরূপ ভাবেই যদি তুমি তাঁহাকে জানিয়া থাক তাহা হইলে তোমার সেই পরমসত্যের কিছুই উপলব্ধি হয় নাই। আবার তুমি যদি সেই আত্মা বা ব্রহ্মকে ঈশ্বর বা জগতের সৃষ্টিকর্ত্তারূপেই মাত্র জানিয়া থাক তাহা হইলেও তুমি তাঁহার সম্বন্ধে অতি অল্পই বুঝিতে পারিয়াছ।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি আমাদের দেহের মধ্যেই আত্মা বাস করিতেছেন এইরূপ উপলব্ধি হয় তাহা হইলে কি করিয়া তাঁহার বিষয় অতিঅল্পই জানা হইবে? বাস্তবিকই ঐ অবস্থায় আত্মাকে অতি অল্পই জানা হইল, কারণ যিনি মনের পরিচালক তিনি তো আর একটিমাত্র স্থানেই আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। আত্মার পরিব্যাপ্তি কোন দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; ইনি দেশ-সীমার অতীত, সুতরাং আত্মা কেবল একটি স্থানেই আছেন আর অপর স্থানে নাই এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা সেই পরম অসীম সত্যের সম্যক্ উপলব্ধি কখনই হইতে পারে না। আবার যদি আমরা মনে করি যে, তিনি আমাদের অন্তরে নাই, কিন্তু আমাদের বহিঃপ্রদেশে আছেন তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব এবং দেশ ও কালের অতীত ভাবটির উপলব্ধি হয় না। যাহা দেশ ও কালের এবং উহাদের সম্বন্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহার অসীমতাকে আমরা অতি সামান্য মাত্রই জানিয়াছি।

এইপ্রকার উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া সেই আত্মজিজ্ঞাসু শিষ্য পুনরায় উপযুক্ত স্থানে যোগাসনে সমাসীন হইয়া ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ তিনি চিন্তার রাজ্য অতিক্রম করিয়া সমাধির অবস্থায় উপনীত হইলেন।

নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থায় কিছুকাল থাকিবার পরে তিনি আবার মন ও ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন: "আমি আত্মা বা ব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে বিদিত হইয়াছি বলিয়া মনে করি না; আবার তাঁহাকে যে একেবারেই জানি নাই এই কথাও বলিতে পারি না। আত্মা জ্ঞাত হইবার নহে বলিয়াই মনে করিতে হইবে যে, আত্মা একেবারেই অজ্ঞাত—এমন নহে; যিনি এইভাবে সত্যকে জানিয়াছেন তিনি সেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়াছেন।"[১] তাঁহার উক্তপ্রকার উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, আত্মজ্ঞান অজ্ঞান ও আপেক্ষিক জ্ঞানের অন্তর্গত নহে, ইহা উহাদের অতীত জ্ঞান। আমরা বিচার-বুদ্ধির দ্বারা যাহা-কিছু জানিয়া থাকি তাহা সেই আত্মা হইতে উদ্ভাসিত জ্ঞানালোকের সাহায্য ভিন্ন জানিতে পারি না। আত্মার জ্ঞাতা আর কেহ নাই যিনি মন ও চিন্তাসমূহকে আলোক দান করিতে সমর্থ হইবেন। বস্তুতঃ আত্মাই একমাত্র নিত্য ও জ্ঞাতা। এই বিশ্বজগতে এমন কিছু নাই যাহা আত্মার জ্ঞাতা; কিন্তু এই আত্মাই আমাদের সমস্ত জ্ঞানের আকর; অর্থাৎ যত প্রকার

১। "নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥"

—কেনোপনিষৎ ২।১০।২।

জ্ঞান আছে তাহা আত্মা হইতেই উদ্ভূত।[১] এই আত্মা সর্ব্বদাই জ্ঞাতা, অর্থাৎ বিষয়ীভাবে অবস্থিত; ইনি কখনও জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয় হন না। আত্মজিজ্ঞাসু সাধক আরও বলিলেনঃ "যিনি মনে করেন যে, আত্মা বা ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, তিনিই যথার্থ তাঁহাকে বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু যিনি মনে করেন 'আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি' তিনি ব্রহ্মকে যথার্থ বুঝিতে পারেন নাই। যাঁহারা মনে করেন ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়াছেন তাঁহারা ব্রহ্মকে জানেন নাই। কিন্তু যাঁহারা মনে করেন যে, ব্রহ্ম কখনই জ্ঞাত হইতে পারেন না, তাঁহারাই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়াছেন।"

উপরে লিখিত উক্তি যেন একটি প্রহেলিকার ন্যায় মনে হয়; বাস্তবিক উহার অর্থ কি হইতে পারে? যদি আমরা আমাদের অনুভূতিগুলি বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে আমরা কি দেখিতে পাই? মনে করা যা'ক যে, আমরা কোনও একটি রূপ দর্শন করিতেছি। বিজ্ঞানের সাহায্যে

১। তত্র নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্—পাতঞ্জলদর্শন

২। "যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥
—কেনোপনিষৎ ২।১১।৩

আমরা এই জানি যে, আকাশের অর্থাৎ "ইথার" (ether) নামক পদার্থের বিশেষ একপ্রকার কম্পনের দ্বারা আলোকরশ্মি উৎপন্ন হয় এবং রূপের অনুভূতিটি ঐ আলোকের সাহায্যেই হইয়া থাকে। আমাদের চক্ষুর মধ্যে অবস্থিত ঝিল্লীতে আলোকরশ্মি পতিত হইলে উহার মধ্যে একপ্রকার আণবিক কম্পন ও পরিবর্ত্তন হয় এবং উহা আক্ষিক স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে মস্তিষ্কের অন্তর্গত ক্ষুদ্র কোষগুলিতে প্রেরিত হইলে উহা হইতেও একরূপ আণবিক কম্পন উত্থিত হয়। তাহার পর ঐ কম্পনগুলিকে অনুভূতিতে পরিণত করিতে অর্থাৎ উহা যে একপ্রকার অনুভূতি তাহার পরিচয় দিতে একজন চৈতন্য সংযুক্ত 'অহং' বা 'আমি' থাকা প্রয়োজন এবং এই পরিচয় দেওয়ার ব্যাপার শেষ হইলে বুঝিতে পারি যে, আমরা একটি রূপ দেখিতেছি। যদি উক্ত 'অহং' না থাকে তাহা হইলে কম্পনগুলি মস্তিষ্কের অন্তর্গত বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে যাইয়া অন্যান্য প্রকার পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিতে পারে, কিন্তু তখন আর আমাদের ঐ 'রূপ'সম্বন্ধে কোন প্রকার অনুভূতি হয় না। যেমন একটি দৃশ্যের উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিলেও যদি হঠাৎ আমাদের মন অন্য একটি বস্তুর বা বিষয়ের উপর আকৃষ্ট হয় তাহা হইলে উক্ত দৃশ্যটি চক্ষুর সম্মুখে

থাকিলেও আমরা আর উহা দেখিতে পাইব না। এখানে আলোকের কম্পন মস্তিষ্কের অন্তর্গত বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে চলিয়া গিয়াছে এবং যথাযথভাবে আণবিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও অনুভূতির নিমিত্ত শারীরিক অন্যান্য পরিণতি-গুলি ঘটিয়াছে, তথাপি 'অহং' বা জ্ঞাতা বিদ্যমান না থাকায় দৃশ্যের অনুভূতি হইল না। কম্পনগুলির অর্থ বুঝাইবার জন্য সেই চৈতন্য-সংযুক্ত 'আমি' বা 'অহং' তখন অন্য কোনও বিষয়ের উপর মনঃসংযোগ করিয়া আছে। কিন্তু যখনই ঐ 'অহং' উপরি উক্ত পরিবর্ত্তনগুলি বুঝাইয়া দেয় তখনই আমাদের অনুভূতি হয়। এই ব্যাপারটি আরও গভীরভাবে অনুধাবন করা যাউক্। আমাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির পশ্চাতে 'অহং' বা 'আমি' প্রজ্ঞাযুক্ত হইয়া অবস্থান করে। এই 'অহং' যদি প্রজ্ঞাবিহীন হয়, অর্থাৎ 'আমি', 'আমার' এই জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে আলোকের কম্পনরাশি ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে এবং আমাদের মনের মধ্যে কোনরূপ অনুভূতি উৎপাদন না করিয়াই বাহির হইয়া যাইবে। আবার যদি মন অনুভূতি ও বুদ্ধির মূল হইতে পৃথক্ অবস্থায় থাকে তাহা হইলে চৈতন্য সংযুক্ত 'আমি'-র সহিত কোনরূপ সংস্পর্শে না আসিয়া অনুভূতিগুলি মনের অবচেতন স্তরে থাকিয়া যাইবে। যিনি

এই অনুভূতিরূপ জ্ঞানের মূল অধিষ্ঠানরূপে অবস্থিত তিনিই আমাদের প্রকৃত আত্মা।

যখন আমরা বসিয়া থাকি তখন আমরা জানি যে আমরা বসিয়া আছি; যখন আমরা ভ্রমণ করি তখন আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা ভ্রমণ করিতেছি; যখন আমরা কোনও কার্য্য করি তখন আমাদের জ্ঞান থাকে যে আমরা ঐ কার্য্য করিতেছি। যিনি এইপ্রকার সকল কার্য্যের বা চিন্তার জ্ঞাতা তিনিই আমাদের দেহ ও মনের যন্ত্রী বা সর্ব্ববিষয়ের পরিচালক। উক্তপ্রকার জ্ঞান কি আমাদের আত্মা হইতে বিভিন্ন অন্য কোনও প্রকার জ্ঞান বিশেষ? না, তাহা নহে। উহা সম্পূর্ণরূপে আত্মার সহিত অভিন্ন। আমাদের আত্মা যেন একটি জ্ঞান-সমুদ্র বিশেষ। কেহ কেহ বলেন যে, আত্মা হইতে জ্ঞান উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ যাহা হইতে জ্ঞানরাশি প্রবাহিত হয় তাহাই আত্মা; উহার দ্বারা এই রূপ বোধ হয় যে, আত্মা জ্ঞান হইতে পৃথক্ এবং ইহার সহিত এই প্রশ্ন ও আসে যে, তাহা হইলে আত্মার স্বভাব বা ধর্ম্ম কি? অদ্বৈত বেদান্তের মতে 'আত্মা' একমাত্র নির্ব্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ বা একমাত্র অখণ্ড চৈতন্য স্বরূপ (absolute intelligence) এবং উহা অপরিবর্ত্তন-শীল। মন ও বুদ্ধির বৃত্তিগুলির অবিরাম পরিবর্ত্তন চলিতেছে, কিন্তু আত্মজ্ঞান অপরিবর্ত্তনশীল। আমাদের

হৃদয়ে যখন একটি ভাবের উদয় হয় তখন আমরা উহা বুঝিতে পারি এবং অনুভব করি যে, ঐ ভাবটি উঠিয়াছে ; আবার যখন ঐ ভাবটি অন্তর্হিত হয় এবং সেইস্থানে অপর একটি ভাবের উদয় হয় তখনও আমরা জানিতে পারি যে, পূর্ব্ব স্থানটিতে একটি নূতন ভাব অধিকার করিয়াছে। যে জ্ঞানবিশেষের দ্বারা আমরা প্রত্যেক নূতন ভাবকে ধরিতে পারি তাহা অন্য কোনপ্রকার জ্ঞানের দ্বারা সম্পন্ন হয় না, কারণ এই জগতে জ্ঞান কেবল একটিই আছে ; সুতরাং ঐ জ্ঞানের জ্ঞাতাকেও অন্য কোন জ্ঞান দিয়া জানিতে পারা যায় না। যাহার দ্বারা আমরা একটি ভাবের বা একটি অনুভূতির অস্তিত্ব জানিতে পারি তাঁহাকে বুদ্ধি, বিচার বা অন্য কোনও মনোবৃত্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায় না। বিচারের দ্বারা বুঝিতে পারা-রূপ ব্যাপারটি ইহারই উপর নির্ভর করে। যখনই আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন বিষয় বুঝিতে পারি তখনই বুঝিতে হইবে যে, উহা মন ও বুদ্ধির পরিচালক একমাত্র নির্ব্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ আত্মারই আংশিক প্রকাশমাত্র।

সর্ব্বজ্ঞতাই আত্মার স্বভাবিক ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের আপেক্ষিক সম্বন্ধের উপর আদৌ নির্ভর করে না। বস্তুতঃ সমস্ত জ্ঞেয় বিষয়ের অস্তিত্ব লোপ পাইলেও এই

নিত্য জ্ঞানস্বরূপের কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না। সর্ব্বজ্ঞ আত্মাকে স্বয়ংপ্রকাশ সূর্য্যের সহিত তুলনা করিলে ব্যাপারটি সহজবোধ্য হয়। সূর্য্য যেমন নিজের আলোকে আলোকিত হন এবং অন্য পদার্থকেও আলোকিত করেন সেইরূপ আত্মাও নিজের জ্যোতিতে নিজে উদ্ভাসিত এবং সেই সঙ্গে তিনি সমস্ত বাহ্যজগৎকেও উদ্ভাসিত করেন। সূর্য্য সমস্ত পদার্থকে আলোক দান করেন এবং সেই সঙ্গে স্বয়ংও আলোকিত হন, সূর্য্যকে দেখিবার জন্য কোনও প্রদীপ প্রজ্বলিত করিবার প্রয়োজন হয় না, আর এজন্য সূর্য্যকে স্বয়ংপ্রকাশ বলা হয়। যাহা স্বয়ংপ্রকাশ তাহাকে প্রকাশিত করিবার জন্য অপর আলোকের সাহায্যের কি আবশ্যক? এই কারণেই আত্মাকে জ্ঞানসূর্য্য বলা হইয়া থাকে। যে জ্ঞান দ্বারা আমরা সর্ব্বপ্রকার অনুভূতি এবং ভাব বুঝিতে পারি, যে জ্ঞান দ্বারা আমরা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাইয়া থাকি, যে জ্ঞান দ্বারা আমরা মনোবৃত্তির ও চন্দ্র সূর্য্যাদির সমস্ত কার্য্যকে জানিতে পারি, যে জ্ঞান দ্বারা আমরা আমাদের শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াসমূহ বুঝিতে পারি তাহা সেই প্রজ্ঞা বা সংবিদের আকর স্বয়ংপ্রকাশ আত্মার আলোক ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই স্বয়ংপ্রকাশ আত্মাই সর্ব্ব বিষয়ের জ্ঞাতা এবং ইনিই মন ও ইন্দ্রিয়াদির একমাত্র পরিচালক ও নিয়ামক।

এই আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিলে মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ কোন কার্য্যই করিতে পারে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, "সূক্ষ্মতর জড়তন্মাত্রার কম্পনবিশেষকে মন বলে" (mind is finer matter in vibration)। বেদান্ত-দর্শনের সিদ্ধান্ত অনুসারে আত্মা এবং মন এক নহে। মনের উপাদানরূপ তন্মাত্রার কম্পনরাশির মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশ নাই; এই মন সংবিদের বা চৈতনের উৎস নহে, অর্থাৎ জ্ঞান মনঃপ্রসূত নহে। মন যাবতীয় ক্রিয়ারহিত হইয়া গেলেও আমাদের 'অহং'-জ্ঞানটি থাকিয়া যায়। সমাধির অবস্থায় কাহারও ভয়, ক্রোধ বা মনের অন্যান্য বৃত্তিসমূহ যথা প্রবৃত্তি, বাসনা, উচ্ছ্বাস, ইচ্ছা, সঙ্কল্প, বিকল্প, নিশ্চয়, অনুভব ইত্যাদি না থাকিলেও প্রকাশরূপ প্রজ্ঞা চলিয়া যায় না, বা সেই সমাধিবান ব্যক্তি সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন হন না। ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধ বোধস্বরূপ আত্মা মনোরাজ্যের কার্য্যাদি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বতন্ত্র।

সমাধির অবস্থায় উপনীত হইয়া সর্ব্বপ্রকার অনুভূতি, মন এবং ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকে নিরোধ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ এই সময়ে দেহ ও মনের সম্পর্ক না রাখিয়া সমাধিবান্ পুরুষ মন ও ইন্দ্রিয়ের রাজ্য অতিক্রম করিয়া উহা অপেক্ষা আরও উচ্চতর ভূমিতে বিচরণ করিতে পারেন। যাঁহাদের কখনও সমাধি হয় নাই তাঁহাদের

পক্ষে এই সত্য উপলব্ধি করা অসম্ভব। বুদ্ধিপ্রসূত আপেক্ষিক জ্ঞান দ্বারা আত্মা প্রকাশিত হন না। এই আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইলে চিন্তার রাজ্য ছাড়াইয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যে যাইবার উপায় শিক্ষা করিতে হইবে। বুদ্ধির দ্বারা আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি তাহা আপেক্ষিক এবং অসম্পূর্ণ; সুতরাং আমাদের বিচার-বুদ্ধি পরিদৃশ্যমান এই বাহ্য জগতের সীমা অতিক্রম করিয়া সেই অসীমের রাজ্যে পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম নহে। সেইজন্যই উপনিষদে বলা হইয়াছে: "যিনি মনে করেন যে তিনি আত্মাকে জানিয়াছেন, তিনি আত্মাকে একেবারেই জানেন নাই।"

ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা যে কল্পনা করিয়া থাকি সেই সমস্ত কল্পনা হইতে আত্মজ্ঞান বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত; কারণ ঈশ্বরসম্বন্ধে সমস্ত ধারণাই আমাদের মনের মধ্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু যদি মন প্রজ্ঞা হইতে পৃথক্ বা বিচ্ছিন্ন থাকে তাহা হইলে ঐ ধারণা বা কল্পনা লুপ্ত হইয়া যায় এবং তাহার কোন অস্তিত্বই থাকে না। আমাদের ভিতর প্রজ্ঞা আছে বলিয়াই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান হইয়া থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ আত্মার আলোক ঈশ্বরের অস্তিত্বের পরিচয় করাইয়া দেয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে,

সগুণ ঈশ্বর ও আত্মা—ইহাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন্‌টি মহত্তর? আত্মাই মহত্তর; কারণ ইহা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকাশ করে। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের অধিষ্ঠান সত্যস্বরূপ এই আত্মা সগুণ ঈশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ সগুণ ঈশ্বরকে বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করা যাইতে পারে এবং মনের দ্বারা চিন্তা করা যাইতে পারে, আর এইজন্য তিনি বাক্য ও মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, সুতরাং তিনি বাক্য ও মনের পরিচালক সেই আত্মারও অধীন। আমরা ইহাও জানি যে, যিনি যাহার অধীন তিনি আত্মা অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট। আবার ইহাও সত্য যে, যখন আমরা আমাদের আত্মাকে জানিতে চেষ্টা করি তখন আমরা একটি পুস্তক বা একটি বৃক্ষের ন্যায় আত্মাকে জ্ঞেয়ভাবে জানিতে চেষ্টা করি না; আত্মা কখনই জ্ঞেয় হইতে পারে না। আত্মা সর্ব্বদাই জ্ঞাতা। আত্মার কোনও প্রকার আকার দেখিতে চেষ্টা করা বৃথা; কারণ আত্মার কোন আকার নাই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদির মধ্যে আমাদের আত্মার অনুসন্ধান আরম্ভ করাও বৃথা, কারণ উক্ত পদার্থগুলি আপেক্ষিক রাজ্যের বস্তু বা বিষয়। কিন্তু আত্মা অতীন্দ্রিয় ও নির্ব্বিশেষ এবং "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। এইরূপে আপেক্ষিক ও নির্ব্বিশেষ রাজ্যের মধ্যে কি প্রভেদ তাহা আমরা বুঝিতে পারি। যতক্ষণ আমরা

আপেক্ষিক রাজ্যে অবস্থান করিব ততক্ষণ আমরা নির্ব্বিশেষকে পাইব না, কারণ এক নির্ব্বিশেষ জ্ঞান দ্বারাই পরস্পর সম্বন্ধে আবদ্ধ বস্তুসকলের অস্তিত্ব আমরা জানিয়া থাকি এবং সেইজন্যই সম্বন্ধভাবযুক্ত সসীম রাজ্যের বহিঃপ্রদেশে এই নির্ব্বিশেষতত্ত্ব অবস্থান করে এবং সর্ব্বদা অসীম পরিদৃশ্যমান বাহ্য বিষয়সকল সেই অসীমের অন্তর্নিহিত এবং তাহারই সত্ত্বায় সত্ত্বাবান্; কিন্তু সেই নির্ব্বিশেষ আত্মা স্বাধীন এবং স্বয়ম্ভূ। যদি আমরা বিচার-বুদ্ধিহীন হইতাম এবং যদি ঐ অবস্থায় আমাদের মধ্যে আত্মজ্ঞান না থাকিত তাহা হইলে আমাদের সহিত ইন্দ্রিয়জ্ঞান এবং মনোবৃত্তির কোনও সম্বন্ধ থাকিত না, অর্থাৎ অনুভূতিসাপেক্ষ কোনপ্রকার জ্ঞানই আমাদের হইত না। মুক্তার মালা যেমন একই সূত্রে গ্রথিত থাকে সেইরূপ এক নির্ব্বিশেষ আত্মরূপী সূত্রে আমাদের বিভিন্ন চিন্তারাশি, বিভিন্ন ভাব এবং চিত্তবৃত্তিরূপ মুক্তাগুলি গ্রথিত হইয়া একটি সুন্দর মালার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। নির্ব্বিশেষ আত্মা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতারূপ মুক্তাগুলিকে যথাযথস্থানে গ্রথিত করিয়া সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড মালার আকারে পরিণত করিতেছে, অর্থাৎ এই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের মধ্যেই আপেক্ষিক জ্ঞানরাশি মুক্তাকারে যেন

শোভিত হইতেছে। কিন্তু কেহ যেন এরূপ ভ্রম না করেন যে, এই বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান এবং সাধারণ আপেক্ষিক জ্ঞান একই শ্রেণীভুক্ত ; কারণ প্রথমটি অসীম এবং দ্বিতীয়টি সসীম ও অজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানমাত্র। সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ আত্মা অজ্ঞানতাকে জানাইয়া দেয় বলিয়া সকল প্রকার আপেক্ষিক জ্ঞান অপেক্ষা উহা উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠ। এই আত্মজ্ঞানের আলোকেই আমরা "ইহা জানি বা ইহা জানি না" এইপ্রকার উপলব্ধি করিতে পারি।

বেদান্ত অথবা উপনিষৎ বলেঃ "যিনি দর্শন করেন, যিনি শ্রবণ করেন, যিনি চিন্তা করেন এবং যিনি মনোগত ভাবরাশিকে উপলব্ধি করেন তাঁহার সাক্ষীস্বরূপ জ্ঞাতা যিনি তিনিই আত্মা। কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত এই সকলগুলিকে আমরা আত্মা বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকি ; প্রকৃতপক্ষে ইহারা আত্মা নহে। ইহাদিগকে যিনি জানেন, তিনিই আত্মা।"

উক্তপ্রকার দেহাত্মবোধে ক্রমে আবদ্ধ হইয়া আমরা বলিয়া থাকি যে, 'আমি দেহ ও ইন্দ্রিয়যুক্ত', 'আমিই দ্রষ্টা', 'আমিই শ্রোতা,' 'আমিই মন-বুদ্ধিযুক্ত', 'আমিই চিন্তা করিতেছি'। এই 'অহং' বা 'আমি'-রূপ আত্মার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বলিয়াই আমরা উক্তপ্রকার 'অহং'-ভাবাপন্ন হই। বস্তুতঃ এই 'অহং' জ্ঞানস্বরূপ

আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। আত্মজ্ঞান এবং আমাদের অস্তিত্ব (সত্তা) অভিন্ন ও এক। 'এইস্থানে আমরা আছি' এই প্রকার যে জ্ঞান তাহা আমাদের স্বতঃই বিদ্যমান। যদি মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের এই জ্ঞান চলিয়া যায়, অথবা যদি মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের পারিপার্শ্বিক জ্ঞান তিরোহিত হয়, তাহা হইলে আমরা ঐ সময়ের জন্য আমাদের চারিদিকের বিষয়গুলির সহিত সমস্ত সম্বন্ধই হারাইব এবং ঐ কালের জন্য আমাদের অস্তিত্বও থাকিবে না। এইরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা আমাদের অস্তিত্ব বা সত্তা হইতে আত্মজ্ঞানকে পৃথক করিতে চেষ্টা করিলেও উহাতে কখনই কৃতকার্য্য হইব না। মায়ামুক্ত আত্মজ্ঞান ও সত্তা অবিচ্ছেদ্য। যখন আমরা আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করিব তখন আমরা আমাদের অস্তিত্বও বুঝিতে পারিব এবং দেখিতে পাইব যে, মনের পরিচালক আত্মাই অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ এবং অসীম সত্তাস্বরূপ। 'সূর্য্য আছেন' এই কথা আমরা বলি কেন ? কারণ সূর্য্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আছে বলিয়াই আমরা ইহা বলিয়া থাকি। যখন তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান থাকে না, যেমন ভাবমগ্ন সমাধিতে আপেক্ষিক সম্বন্ধের দিক দিয়া কোন জ্ঞানই আমাদের থাকে না ; সুতরাং সত্য যে, আমাদের আপেক্ষিক জ্ঞান ও আপেক্ষিক সত্তার

মাপকাঠি প্রজ্ঞা বা 'অহং'-জ্ঞান, অর্থাৎ 'আমি আছি' এই বোধ না থাকিলে অপর কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে কিছুই আমি জানিতে পারিব না, বা 'অপর কিছু আছে' এইপ্রকার জ্ঞানও আমার হইবে না। যে মুহূর্ত্তে আমাদের দেহের জ্ঞান এবং পারিপার্শ্বিক বিষয়ের জ্ঞান থাকে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের নিকট উহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপ ব্যাপার আমাদের সুষুপ্তি বা গভীর নিদ্রার সময় ঘটিয়া থাকে। সেজন্য সেই সময়ে আমরা 'ইহা আমার' 'উহা আমার' এইপ্রকার ধারণা করিতে পারি না; কিন্তু আবার দেহে যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতে থাকে তখনই সঙ্গে সঙ্গে দেহটিকে এবং তাহার সংস্পর্শে সমস্ত বস্তুকেই 'আমার' বলিয়া অনুমিত হয়; অতএব দেখা যাইতেছে যে, শুদ্ধজ্ঞান এবং নির্ব্বিশেষ সত্ত্বা এই দুইটিই এক ও অভিন্ন।

বেদান্তদর্শনে মনের পরিচালক আত্মার স্বভাব দুই প্রকার বলা হইয়াছে: একটির নাম 'সৎ' বা অস্তিত্ব, অর্থাৎ যাহা নিত্য বর্ত্তমান এবং অপরটির নাম 'চিৎ' অর্থাৎ যাহা নিত্যপ্রকাশ বা জ্ঞান। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, এই 'সৎ' এবং 'চিৎ' অবিচ্ছেদ্য; একটি থাকিলেই অপরটিও থাকিবে। বেদান্ত-দর্শনে আবার আর একটি ধর্ম্মের উল্লেখ পাওয়া যায়, উহার

নাম 'আনন্দ'। যেখানে 'সৎ' ও 'চিৎ' বর্ত্তমান থাকে সেখানে 'আনন্দ'ও বর্ত্তমান থাকিবে। এই নিত্য আনন্দের সহিত পরিবর্ত্তনশীল ইন্দ্রিয়সুখের এবং অনিত্য বিষয়জনিত বিষয়ানন্দের যথেষ্ট প্রভেদ আছে। যেখানে 'নিত্য আনন্দ' বর্ত্তমান সেখানে চিরশান্তিও বিরাজমান থাকিবে, এবং সেই অবস্থায় মন অন্য কিছুই না চাহিয়া ঐ আনন্দই উপভোগ করিবে ও যাহাতে উহার বিচ্ছেদ না আসে সেইরূপ ভাবকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে। কখনও কখনও আমরা সাধারণ আনন্দকে অর্থাৎ বিষয়ানন্দকে আত্মানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ বলিয়া ভ্রমে পতিত হই। বিষয়ানন্দ যখন ভোগ করা যায় তখন উহা সেই সময়ের জন্য মধুর মনে হয়, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই উহাতে বিতৃষ্ণা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তখন ঐ বিষয় ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা না করিয়া উহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। একবার ভাবিয়া দেখুন যে, ইন্দ্রিয়ভোগজনিত সুখ কিরূপ ক্ষণস্থায়ী। উহা অতি অল্প সময়ই থাকে এবং উহার প্রতিফলও অত্যন্ত দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। কিন্তু যাহা অবিনাশী 'আনন্দ' তাহাকেই 'ব্রহ্মানন্দ' বলে। ইহা অপরিবর্ত্তনশীল, চিরস্থায়ী এবং তাহার কোনপ্রকার প্রতিক্রিয়া নাই। যখন দেহাত্ম-বোধ চলিয়া যায় এবং আত্মজ্ঞান প্রতিভাত হয় তখনই ব্রহ্মানন্দ ও নির্ম্মল শান্তি বিরাজ করে। আত্মার রাজ্য

স্বভাবতই এইপ্রকার; ইহা আপেক্ষিক জগতের এবং পার্থিব নিয়মাদির সম্পূর্ণ বাহিরে অবস্থিত। পূর্ব্বে বর্ণিত সেই সত্যান্বেষী সাধক পরিশেষে জগতের সমস্ত বস্তুর মূল-কারণ ও মনের পরিচালক আত্মাকেই সৎ-চিৎ-আনন্দরূপে সমাধির অবস্থায় উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

তাহার পরে তিনি বলিলেন: যে ব্যক্তি এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করেন, তিনি অমরত্ব লাভ করেন। দেহের পরিবর্ত্তনের নামই মৃত্যু। এই দেহের মৃত্যু হইতে পারে, মনের মৃত্যু হইতে পারে, ইন্দ্রিয়াদির মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার কখনও মৃত্যু নাই। যখন আমরা জানিতে পারি যে, দেহের মরণাপন্ন অবস্থা ঘটিতেছে তখন যদি আমরা তাহার সহিত আমাদিগকে একাত্মবোধ দ্বারা একীভূত না করি এবং তখন যদি আমরা আমাদের নির্ব্বিশেষ আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্‌রূপে উপলব্ধি করি তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই অমরত্ব লাভ করিতে পারিব। একবার যদি আমাদের মধ্যে 'সোঽহং আত্মা' অর্থাৎ 'আমি সেই আত্মা' এই অনুভূতি হয় তাহা হইলে মৃত্যুও কি উহা আর পরিবর্ত্তন করাইয়া দিতে পারে? যাহা 'অসৎ' অর্থাৎ যাহা নাই তাহা হইতে 'সৎ'-এর উৎপত্তি হইতে পারে না; সেইরূপ 'সৎ' কখনও 'অসৎ'-এ পর্য্যবসিত হয় না।

যাহা 'নিত্য' তাহা অনিত্য হইতে পারে না[১] এবং ইহাই অমরত্ব বা অমৃতত্বের প্রমাণ। নির্ব্বিশেষ জন্ম-মৃত্যুহীন আত্মাই সেই নিখিল বিশ্বের আদি ও অন্তস্বরূপ ব্রহ্ম। ঐ নিত্য আত্মা বা ব্রহ্মকে বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন আকারে সাধারণ লোক 'ঈশ্বর' বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। ঐ ব্রহ্মই অন্তরাত্মারূপে আমাদের অন্তরে বাস করেন এবং আমাদের আত্মা হইতে ঐ 'ব্রহ্ম' অভিন্ন। তাঁহাকেই উপনিষদে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, কারণ উহা এক ভিন্ন বহু নহে। যদি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বহু হইত তাহা হইলে একটি অপরটির দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া যাইত, সুতরাং তাঁহারা অসীম ব্রহ্ম হইতে পারিত না। এক ব্রহ্মই অবিনশ্বর ও মৃত্যুরহিত। একমাত্র ব্রহ্মকে বিদিত হইয়াই আমরাও অমৃত হইতে পারি। যদি স্বভাবতঃই আমাদের আত্মাতে অমরত্ব নিহিত না থাকে তাহা হইলে কোনও অবতার-পুরুষই উহা আমাদিগকে দান করিতে সক্ষম হইবেন না। খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বীদের বিশ্বাস যে, একমাত্র ঈশ্বরাবতার যীশুখৃষ্টের কৃপাতেই মরণশীল জীব অমর হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের ওই বিশ্বাস আমাদের

১। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

—গীতা ২।১৬

আত্মার অমরত্বরূপ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। খৃষ্টানদের এইরূপ বিশ্বাসে এবং উপদেশে বেদান্তমতাবলম্বীরা প্রতারিত হন না। তাঁহারা প্রথমে তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ বা আত্মাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন, তাহার পর তাঁহারা জানিতে পারেন যে, অমরত্বে তাঁহাদের জন্মগত অধিকার।

আত্মা সর্ব্বপ্রকার শক্তির মূল এবং এইজন্য শিষ্য বলিলেন: "আত্মজ্ঞানের দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি ও অমরত্ব লাভ করা যায়।" অপরিবর্ত্তনশীল অবিনশ্বর আত্মাকে জানিতে পারিলেই আমাদের মধ্যে প্রকৃত আত্মিক শক্তি উদ্বুদ্ধ হইবে। আত্মজ্ঞানের দ্বারা যে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করা যায় তাহা ভৌতিক, দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক শক্তিসমূহের সমষ্টি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। আধ্যাত্মিক শক্তি ভিন্ন আর সকলপ্রকার শক্তিই পরিবর্ত্তনশীল ও মৃত্যুর অধীন। অতিঅল্প লোকেই কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তির অর্থ ঠিক্ ঠিক্ বুঝিতে পারেন। 'আত্মা' শব্দদ্বারা 'প্রেতাত্মা'কে বুঝায় না; ইহার দ্বারা 'পরমাত্মা' বা 'ব্রহ্ম'কে বুঝিতে হইবে। চৈতন্যস্বরূপ আমাদের আত্মা সেই ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোন বস্তু নহে। ব্রহ্ম বা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিলেই দৈহিক ও মানসিক শক্তি অপেক্ষা মহত্তর আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ

করা যায়। এই শক্তি সেই অনন্ত ব্রহ্মের বা আত্মারই শক্তি। দৈহিক শক্তির সাহায্যে হয়তো একজন একটি ব্যাঘ্র বধ করিতে পারেন বা সহস্র সহস্র প্রাণী বধ করিতে পারেন, কিন্তু ঐ শক্তি তাহাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। যদি কাহারও প্রভূত আধি-ভৌতিক ক্ষমতা থাকে তাহা হইলেও উহা তাহাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। কাহারও হয়তো অদ্ভুত মানসিক শক্তি ও যোগের বিভূতি থাকিতে পারে এবং ঐ শক্তির সাহায্যে তিনি অনেক আশ্চর্য্য-জনক কার্য্যাদি করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার দেহ ও মনের মধ্যে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন স্বতঃই হইয়া থাকে, তিনি ঐ শক্তির দ্বারা তাহা স্থগিত রাখিতে পারেন না। অপরপক্ষে আত্মজ্ঞান লাভ দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি প্রাপ্ত হইলেই জন্ম-মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যিনি কেবল দৈহিক ও মানসিক শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, তিনি জন্ম ও মৃত্যুর অধীনই থাকিবেন, কিন্তু তিনি যদি সেই অবিনাশী ব্রহ্ম বা আত্মাকে বিদিত হইতে পারেন তাহা হইলে তিনি এই বিশ্বের প্রভু বা নিয়ন্তাও হইতে পারেন। যাঁহার আত্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, প্রাকৃতিক বিরাট্ শক্তিসমূহ তাঁহার সেবা করে এবং আদেশ পালন করে। "যদি কেহ এই জীবদ্দশায় আত্মাকে উপলব্ধি

করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। এই মায়াময় জগতে যিনি আত্মাকে জানিয়াছেন তিনিই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে সিদ্ধ হইয়াছেন; তিনিই মোক্ষ, পরাশান্তি এবং প্রকৃত আনন্দ এই জীবনে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু যদি কেহ তাঁহাকে এই জীবদ্দশায় জানিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহার অদৃষ্টে অনেক দুঃখভোগ আছে।"[১] যিনি আত্মাকে উপলব্ধি করিতে না পারেন, তিনি এই জগতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়া ইন্দ্রিয়-সুখের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন ও অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তিনি কর্ম্মফল ও পুনর্জন্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন না। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ চেতন ও অচেতন বস্তুতে ব্যাপ্ত সেই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া দেহত্যাগ করিবার পরে অমরত্ব লাভ করিয়া থাকেন।"[২] যিনি সেই একমাত্র অবিনাশী আত্মা বা ব্রহ্মকে বিদিত হইয়াছেন, তিনি তাঁহার সহিত স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন হইয়া যান এবং অনন্ত কাল ধরিয়া ব্রহ্মস্বরূপতায় অবস্থান করেন।

১। "ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি, ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।"
—কেন উপনিষৎ ২।১৩

২। "ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ, প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥"
—কেন উপনিষৎ ২।১৩

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং, ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ॥"—ছান্দোগ্য ৭।২৩।১।

"আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণতঃ আত্মোত্তরতঃ আত্মৈবেদং সর্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতি তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।"—ছান্দোগ্য ৭।২৫।২।

যাহা ভূমা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ তাহাই সুখ; যাহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন তাহাতে সুখ নাই। ভূমাই সুখস্বরূপ; অতএব এই ভূমাসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা উচিত।"

"আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই ঊর্দ্ধভাগে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে, আত্মাই এই সমুদয় জগৎ—যিনি এই প্রকার দর্শন করেন, এই প্রকার মনন করেন, এই প্রকার বিজ্ঞান (অনুভূতি) লাভ করেন তিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দ হন, তিনিই স্বরাট্ হন অর্থাৎ স্বারাজ্য লাভ করেন এবং সমস্ত লোকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আত্মা ও অমরত্ব

যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত আছে যে, পুরাকালে ভারতবর্ষে যাজ্ঞবল্ক্য নামে একজন পুণ্যাত্মা ধর্ম্মপরায়ণ সত্যদর্শী ঋষি বাস করিতেন। মৈত্রেয়ী নামে তাঁহার এক সাধ্বী পতিগতপ্রাণা পত্নী ছিলেন। গৃহস্থাশ্রমের যে সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম, কেবল তাহা সম্পন্ন করিয়াই যাজ্ঞবল্ক্য নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, পরন্তু দেশের ও জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যও তিনি যথেষ্ট সৎকর্ম্ম সাধন করিয়া মহাশান্তিতে কালাতিপাত করিতেন। এইরূপে নিঃস্বার্থ সৎকর্ম্মাদির দ্বারা ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইলে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি সত্যস্বরূপ আত্মার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তপস্যার ফলে নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই পরিদৃশ্যমান্ বাহ্যজগৎ ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য, গার্হস্থ্য জীবন মনুষ্যের ক্রমোন্নতির পক্ষে একটি সোপান বা স্তর মাত্র; সেজন্য তিনি মনস্থ করিলেন যে, গৃহস্থাশ্রম হইতে অধিকতর উন্নত সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া তিনি জীবন যাপন করিবেন।

তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সংসারী লোকেরা মোহে অভিভূত হইয়া পার্থিব বাসনা চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। সেই কারণে তিনি নির্জ্জনে বাস করিয়া নিত্য বস্তুর ধ্যানে তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া সংসারের বিষয়-কোলাহলের বহুদূরে অরণ্যে বাস করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে তিনি ইচ্ছা করিলেন; পরমাত্মার ধ্যানে দিবানিশি নিমগ্ন থাকিয়া এবং চিত্ত-নিরোধরূপ সমাধি লাভ করাই যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল।

একদিন এই ঋষি তাঁহার পত্নীর নিকট আসিয়া বলিলেন: "মৈত্রেয়ি, প্রিয়তমে! আমার একান্ত ইচ্ছা যে, সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তোমাকে দান করিয়া আমি বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করি। তুমি এই সমস্ত ভোগ কর এবং সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে এই বিষয়ে অনুমতি প্রদান কর।"[১] স্বামীর এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম-পরায়ণা মৈত্রেয়ী সন্তপ্ত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন: "ভগবন্,

১। "মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যাঽন্তং করবাণীতি।"

—উঃ, বৃহদারণ্যক ৪।৫।২

অনুগ্রহ করিয়া বলুন, যদি আমি সসাগরা পৃথিবী এবং সর্ব্বপ্রকার পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হই তাহা হইলে আমি কি তাহার দ্বারা অমরত্ব লাভ করিতে পারিব?"[২] বর্ত্তমান কালে আমরা যে সমস্ত নারী দেখিতে পাই তাঁহাদের অধিকাংশই ধন-সম্পত্তির অধিকারিণী হইবার জন্য লালায়িতা; আবার যদি কোনও সূত্রে সামান্য সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারিণী হইবার কাহারও আশা থাকে, তাহা হইলে তাহাতেই তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইয়া থাকেন। মৈত্রেয়ী কিন্তু এই প্রকার নারী ছিলেন না; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, অমরত্বের ন্যায় অপূর্ব্ব সম্পদ আর কিছুই নাই। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি তাঁহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: "আপনি যে সমস্ত ধন-সম্পত্তি আমাকে দান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হইলে কি আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব?" এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন: "না, এইরূপ ঐশ্বর্য্যের দ্বারা অমরত্ব লাভের কোনও আশা নাই; কেহ কখনও পার্থিব সম্পত্তির দ্বারা অমর হইতে পারে না। তবে যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পত্তি প্রাপ্ত হও তাহা হইলে তুমি ধনবান্ লোকের মতন যখন যাহা ইচ্ছা

২। "সা হোবাচ মৈত্রেয়ী, যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ, স্যাং ন্বহং তেনামৃতাহো।"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।৩

হইবে তাহা লাভ করিয়া পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে পারিবে।"[৩] এই কথা শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন: "স্বামিন্, যে বস্তুদ্বারা আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব না, সে বস্তু লইয়া আমি কি করিব? যদি আপনার নিকট এমন কোন বস্তু থাকে যাহার দ্বারা আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারি, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সেই বস্তু দান করুন, আমি আপনার অন্য ঐশ্বর্য্যের জন্য লালায়িতা নহি।"[৪]

মৈত্রেয়ীর কথা শুনিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন: "মৈত্রেয়ি, বাস্তবিকই তুমি আমার প্রিয়তমা। তুমি তোমারই উপযুক্ত কথা বলিয়াছ। যাহার দ্বারা অমরত্ব লাভ হয় তাহাই আমি বলিতেছি, তুমি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।"[৫] তাহার পরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য পরম প্রেমাস্পদ বস্তুর যথার্থ

৩। "নেতি; নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং, তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাঽস্তি বিত্তেনেতি॥"
—বৃহদারণ্যক ৪।৫।৩

৪। "সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহচ তেন কুর্য্যাং, যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি॥"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।৪

৫। "স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ, প্রিয়া বৈ খলু নো ভবতী সতী প্রিয়ং অবৃধৎ, হন্ত তর্হি ভবত্যেতদ্ব্যাখ্যাস্যামি তে, ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি॥"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।৫

স্বরূপ কি তাহা প্রথমে ব্যাখ্যা করিলেন। লোকে তাহাদের পিতামাতাকে, সন্তানাদিকে, স্বামীকে, স্ত্রীকে এবং ধনসম্পত্তি ও অন্যান্য যাহা কিছু আপনার বলিতে আছে সে সকলকেই মাত্র ভালবাসে ; কিন্তু তাহারা কাহাকে বস্তুতঃ ভালবাসে তাহা কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারে না। তাহাদের প্রকৃত ভালবাসার পাত্র কখনও কোন পাঞ্চভৌতিক পদার্থ হইতে পারে না। কিন্তু পাঞ্চভৌতিক আকৃতির পশ্চাতে যে আত্মা অবস্থান করিতেছেন তাহাই প্রকৃত ভালবাসার পাত্র হইয়া থাকে। এই কারণে মহর্ষি মৈত্রেয়ীকে বলিলেন : "প্রিয়ে, তোমাকে সত্যই বলিতেছি যে, পত্নী তাহার স্বামীর পাঞ্চভৌতিক দেহকে স্বামী বলিয়া ভালবাসে না, তাহার স্বামীর মধ্যে যে আত্মা অবস্থান করিতেছেন তিনিই যথার্থ স্বামীরূপে স্ত্রীর নিকট প্রিয় হইয়া থাকেন।"[৬]

স্বামীর পাঞ্চভৌতিক শরীর যে সমস্ত জড় পরমাণুপুঞ্জ দ্বারা গঠিত সেই সমস্ত উপাদানকে পত্নী ভালবাসে না, সে তাহার স্বামীর আকৃতির পশ্চাতে অবস্থিত সেই আত্মাকেই ভালবাসিয়া থাকে। আবার "স্বামী তাহার পত্নীর স্থূল শরীরকে পত্নী বলিয়া ভালবাসে না, কিন্তু ঐ পত্নীর দেহের

৬। "স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি॥"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬

মধ্যে যে আত্মা আছেন তাহাই স্বামীর প্রেমাস্পদ।"[৭] প্রকৃতপক্ষে পত্নীর স্থূল দেহটি স্বামীর প্রিয় নহে, কিন্তু তাহার আত্মাই স্বামীর নিকট প্রিয় বস্তু। যখন পত্নীর দেহ হইতে আত্মা চলিয়া যায় তখন সেই মৃতদেহটির প্রতি স্বামীর ভালবাসা থাকে না, এমন কি স্বামী তখন উহা আর স্পর্শই করিবে না। "লোকে তাহাদের সন্তানগণের জড় দেহকে সন্তান বলিয়া ভালবাসে না, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আত্মা বিরাজ করিতেছেন বলিয়া তাহারা এত ভালবাসার পাত্র হইয়া থাকে।"[৮]

যখন মাতা তাঁহার সন্তানকে ভালবাসেন তখন আপনারা কি মনে করেন যে, যে সমস্ত পাঞ্চভৌতিক জড় উপাদানের দ্বারা সন্তানের মুখমণ্ডল গঠিত সেই সমস্ত অচেতন জড় পদার্থকেই মাতা ভালবাসিতেছেন? না, তাহা নহে; জড় পরমাণুপুঞ্জের অন্তরালে অবস্থিত আত্মাই সন্তানের আকৃতি সৃষ্টি করিয়া মাতার আত্মাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ভৌতিক জড় পদার্থের মধ্যে ভালবাসার অস্তিত্ব দেখা যায় না। অধ্যাত্ম রাজ্যে দুইটি আত্মার পরস্পরের আকর্ষণের নামই

৭। "ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি॥"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬

৮। "ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি॥"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬।

প্রেম অথবা ভালবাসা। যখন লোকে তাহাদের বন্ধু বা আত্মীয়বর্গকে ভালবাসে তখন সেই আকর্ষণটিই উহাদের ভালবাসার বাহ্যিক প্রকাশের মূলে আছে ইহাই বুঝিতে হইবে। "প্রিয়ে, বাস্তবিকই ধনসম্পদ ভালবাসার পাত্র নহে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, আত্মার প্রতি ভালবাসা আছে বলিয়াই সম্পদ বা ঐশ্বর্য্য প্রিয়বস্তু বলিয়া বোধ হয়।"[১]

ভালবাসার কেন্দ্র হইতেছেন আত্মা। যখন আমরা ঐশ্বর্য্য বা বিষয়-সম্পত্তিকে প্রিয়বস্তু বলিয়া মনে করি তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, অর্থ অথবা সম্পত্তির উপর যে আকর্ষণ বা ভালবাসা দেখা যায় তাহা জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত আত্মার অথবা স্বীয় আত্মার প্রতি ভালবাসা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। আমরা যে পশু, পক্ষী, অশ্ব, কুকুর প্রভৃতিকে ভালবাসিয়া থাকি তাহা উহাদের স্থূল দেহের জন্য নহে, কিন্তু উহাদের মধ্যে আত্মা বিরাজ করেন বলিয়াই উহাদিগকে আমরা এইরূপ ভালবাসিয়া থাকি। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে এইরূপ বুঝাইয়াছিলেন যে, যেখানেই প্রকৃত ভালবাসা আছে সেখানেই আত্মার প্রকাশ বিদ্যমান। তিনি বলিলেন: "প্রিয়ে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়

১। "ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি॥"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬

প্রভৃতি মনুষ্যগণের মধ্যে আত্মা আছেন বলিয়াই লোকে তাহাদিগকে ভালবাসিয়া থাকে।”

কাহারও মৃত দেহটি আমাদের অন্তঃকরণে ভালবাসা উদ্দীপিত করে না। “লোকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে, স্বর্গাদি লোককে, দেবতাদিগকে, চারি বেদকে এবং অন্যান্য চেতন ও অচেতন বস্তুগুলিকে তাহাদের বৈশিষ্ট্যের জন্য ভালবাসে না, পরন্তু উহাদের মধ্যে আত্মার প্রকাশ আছে বলিয়াই লোকে উহাদিগকে ভালবাসিয়া থাকে।”[১০]

যখন কেহ নিজের “অহং”-এর তৃপ্তির জন্য অপরকে ভালবাসে তখন বুঝিতে হইবে যে, ঐ ভালবাসা অত্যন্ত স্বার্থজড়িত, কিন্তু যখন ঐ ভালবাসার নির্ঝর ধারা অপরের অন্তরস্থ আত্মার দিকে প্রবাহিত হয় তখন স্বার্থপরতার ভাবটি আর থাকে না। উহা ক্রমে ক্রমে পবিত্র ঐশ্বরিক প্রেমে

১০। “ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি॥”—বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬

পরিণত হয়। জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই অপরিবর্ত্তনীয় চৈতন্যময় আত্মা বিরাজ করিয়া অপরের আত্মাকে আকর্ষণ করে। আমরা সেই আত্মার স্বরূপ অবগত নহি যাহার অভিমুখে আমাদের স্বার্থপর অথবা নিঃস্বার্থ ভালবাসার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে এবং যাহা হইতে উক্ত স্রোত নিঃসৃত হইয়া মনুষ্য, পশু, দেবতা অথবা পার্থিব ধন, সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি ধাবিত হইতেছে। একজন কৃপণ মোহবশতঃ তাহার বিষয়-ঐশ্বর্য্যকে ভালবাসে, কিন্তু সে ভালরূপে জানে যে, সেই ঐশ্বর্য্য কেবল বিনিময়ের একটি উপায়মাত্র এবং ঐ ঐশ্বর্য্যের দ্বারা কিছু দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মাত্রই লাভ করিতে পারা যায়। সে নিজের দেহাত্মবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া দেহটিতেই অত্যন্ত আসক্ত হয় এবং সেই দেহটিকে পরিপাটী রাখিবার উপায়-রূপে ঐ অর্থকেই ভাল-বাসিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোকের স্থূল দেহটিই হইতেছে আকর্ষণের কেন্দ্রস্বরূপ, অর্থাৎ যাহা কিছু সে করে তাহা ঐ দেহের তৃপ্তির জন্যই করে এবং সেই কারণবশতঃ যাহা কিছু তাহাকে সুখী করে তাহা তাহার অতীব প্রিয়বস্তু। "মৈত্রেয়ি, সেইজন্যই আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, এই আত্মার বিষয় শ্রবণ করিতে হইবে, চিন্তা করিতে হইবে এবং ধ্যান করিতে হইবে। প্রিয়ে, যখনই এইরূপ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারা

যায় তখনই সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়।"[১১] যাহা হইতে অবিরাম প্রেমধারা নিঃসৃত হইতেছে এবং যাহার অভিমুখে তাহা প্রবাহিত হইতেছে সর্ব্বপ্রকার আকর্ষণের সেই কেন্দ্রস্বরূপ আত্মার প্রকৃত ধর্ম্মসসমূকে জানিতে হইবে; আত্মার বিষয় সর্ব্বদা শ্রবণ করিতে হইবে এবং তাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে। যখন এই আত্মাতে মন নিবিষ্ট হইবে তখনই ইঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হইবে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই আত্মজ্ঞান ও অমরত্ব লাভ হইবে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন: "যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে তাহার স্থূলদেহ অথবা তাহার ধন-সম্পত্তির জন্য ভালবাসে তাহা হইলে সে ঐ প্রেমাস্পদ ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিশ্চয়ই কোন-না-কোন সময়ে পরিত্যক্ত হইবে। যদি আমরা কাহারও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস না রাখিয়া অচেতন পরমাণুরাশির সমষ্টিরূপ তাহার জড় দেহটিকেই ভালবাসি, অর্থাৎ তাহার "আত্মা" বলিয়া কোন বস্তু নাই এই ধারণা করিয়া জড় দেহটিই সেই ব্যক্তি এই বিবেচনা করি এবং তাহার পাঞ্চভৌতিক দেহটির প্রতি ভালবাসা

১১। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মানি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্বং বিদিতম্॥" —বৃহদারণ্যক ২।৪।৫

দেখাই তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কি সন্তুষ্ট হইতে পারে? কখনই না। বরং সেই ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ আমাদিগের সংসর্গ ত্যাগ করিবে। যদি আমরা কোনও ব্রহ্মবিদ্‌কে আত্মারহিত জড় পদার্থ-রূপে ধারণা করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি এবং যদি তিনি আমাদের মনের ভাব বুঝিতে পারেন তাহা হইলে অবিলম্বে তিনি আমাদের সঙ্গ অবশ্যই ত্যাগ করিবেন।"[১২]

যদি আমরা রাজার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি যে, তিনি আত্মাহীন জড় পদার্থের পিণ্ড তাহা হইলে রাজা আমাদিগকে কখনই ভালবাসিবেন না, বরং তিনি আমাদিগকে দূর করিয়া দিবেন। "এই কারণবশতঃ যিনি মনে করেন স্বর্গাদি যাবতীয় লোকের মধ্যে আত্মা নাই, দেবতাগণের মধ্যে আত্মা নাই, বেদসমূহের মধ্যে আত্মা নাই, বা চেতনধর্ম্ম জীব ও অচেতন পদার্থ

১২। "ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ। লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ। দেবাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ। বেদাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ। ভূতানি তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ। সর্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্বং বেদ। ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্বং যদয়মাত্মা॥"

—বৃহদারণ্যক ২।৪।৬

সকলের মধ্যে আত্মা নাই, তিনি উপরোক্ত প্রত্যেকটির দ্বারা পরিত্যক্ত হইবেন।" যদি আমরা পরলোকগত আত্মীয়স্বজনের ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে 'আত্মা নাই' এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করি, অথবা আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করি তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। যদি আমরা ঈশ্বরকে অচেতন জড় পদার্থ বলিয়া ধারণা করি এবং তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ অবিনশ্বর ও সর্ব্বব্যাপী সত্তাকে ভালবাসিতে না পারি তাহা হইলে তিনি কখনই আমাদিগের মধ্যে প্রকাশিত হইবেন না; বরং আমাদিগের অগোচর হইয়া থাকিবেন। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, সর্ব্ব অস্তিত্বের-স্বরূপ আত্মাকে বাদ দিলে কোনও বস্তুরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। আত্মার সহিত সম্বন্ধকে বাদ দিয়া আমরা যে কোন বস্তুর চিন্তা করিব সেই বস্তু আমাদিগের ধারণার মধ্যে আসিবে না, অর্থাৎ তাহারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, কারণ বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ সর্ব্বব্যাপী আত্মার সহিত কোন-না-কোন প্রকার সম্বন্ধে যুক্ত থাকিয়া অবস্থান করিতেছে। আত্মা সর্ব্বভূতে পরিব্যাপ্ত এবং সর্ব্বভূত আত্মাতে বিদ্যমান। যাহা-কিছু আমরা দর্শন করি অথবা যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; যাহা-কিছু আমরা জানি এবং চিন্তা করি সে সমস্তই আত্মার

সহিত অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে সংযুক্ত ; বস্তুতঃ সকল পদার্থই আত্মার সহিত অভিন্নভাবে বর্ত্তমান। প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় পদার্থ স্বরূপতঃ সেই আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, প্রত্যেক বস্তুই আত্মা হইতে অভিন্ন ইহা আমাদিগের উপলব্ধি হওয়া কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে ? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই প্রশ্নের সমাধান করিতেছেন : "ঢাকের কাঠির দ্বারা আঘাত করিলে ঢাক হইতে যে শব্দ নির্গত হয়, সেই শব্দ যে অন্যান্য শব্দ হইতে পৃথক্ এই তথ্য বুঝিতে হইলে যেমন ঐ শব্দের মূল ভিত্তিস্বরূপ ঢাক বা ঢাকের কাঠির উল্লেখ করিলে বুঝা যায়, অন্য কোন উপায়ে উহার পার্থক্য বুঝা যায় না, সেইরূপ কোনও বস্তুর অস্তিত্ববোধের মূলে যে জ্ঞানস্বরূপ আত্মা বিদ্যমান এবং যাহা ভিন্ন কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না সেই আত্মার অস্তিত্বকে আশ্রয় করিয়া উহার বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান হইয়া থাকে, নতুবা ঐ বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব বোধ হয় না।[১৩]

"শঙ্খ, বীণা অথবা কোনপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইলে যে ধ্বনি শ্রবণ করা যায়, সেই ধ্বনিগুলির বৈশিষ্ট্য বুঝিতে

১৩। "স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায়, দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥" —বৃহদারণ্যক ২।৪।৭

হইলে যাহা হইতে ঐ ধ্বনি উদ্ভূত হইতেছে তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; আবার এই যে বিভিন্নপ্রকার ধ্বনি, উহা বস্তুতঃ একই মূল শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশমাত্র। সেইরূপ এই বিশ্বরাজ্যের মূলে যে একমাত্র সত্য বস্তু সর্ব্বব্যাপী আত্মা বিদ্যমান আছেন তিনিই নাম-রূপের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগের নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন।[১৪]

যেমন সিক্ত কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিলে আপাতঃপ্রতীয়মান ধূম ও অগ্নিবিহীন ঐ কাষ্ঠরাশি হইতে প্রথমে ধূমরাশি ও পরে অগ্নিশিখা নির্গত হয়, হে প্রিয়তমে! সেইরূপ সমস্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আকর সেই এক পরমাত্মা (ব্রহ্ম) হইতে স্বতঃই ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব এই চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, দর্শনশাস্ত্রসমূহ এবং উপনিষৎ, বিজ্ঞান, সূত্র, ভাষ্য ইত্যাদি যাহা কিছু এই জগতে বা অন্যান্য সমস্ত লোকে জ্ঞাতব্য আছে সে সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছে।"[১৫]

১৪। "স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায়, শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ॥"—বৃহদারণ্যক, ২।৪।৮

১৫। "স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্‌ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ

সাধারণতঃ আমরা বলিয়া থাকি যে, অমুক অমুক ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা এই এই জ্ঞান বা বিজ্ঞান লাভ করিয়াছি; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সকল প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞান যাহা পদার্থবিৎ, দার্শনিক, যোগী, বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় সে সমস্তই অনন্ত জ্ঞানের আধারস্বরূপ এক পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বা নিঃসৃত হইয়াছে। যেমন এক প্রজ্বলিত বহ্নি হইতেই ধূম, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিশিখা-সমূহ নির্গত হয় সেইরূপ এক অনন্ত ব্রহ্ম হইতে বিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে বর্ণিত আধ্যাত্মিক সত্য এবং কলাশাস্ত্র ও ইতিহাসের অন্তর্গত তথ্যসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে। আমাদের যে স্বাভাবিক জ্ঞান (common sense) আছে এবং যাহা আমরা আমাদের দৈনিক জীবনে ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা সেই নিত্য এক অবিনাশী অপরিবর্ত্তনশীল ও অনন্ত জ্ঞানসমষ্টির স্বরূপ আত্মারই বিকাশমাত্র এবং এই জ্ঞান-ঘনকে যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

স্বৃষ্টির প্রারম্ভে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তু

সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি * * অস্যৈবৈতানি সর্বাণি নিঃশ্বসিতানি ॥”
—বৃহদারণ্যক ২।৪।১০

এবং প্রকৃতির শক্তিসমূহ অব্যক্তরূপে এক অনন্ত ব্রহ্মে লীন ছিল এবং ক্রমবিকাশের নিয়মানুযায়ী সেই সুপ্তা প্রকৃতি স্বতঃই নানারূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রুতি বলিতেছেন : "তর্হ্যেদমব্যাকৃতমাসীৎ।" যেমন ব্যক্তিমাত্রই ফুস্‌ফুসের মধ্যে যে বায়ুরাশি নিঃশ্বাসরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহাকে অনায়াসে প্রশ্বাসরূপে বহির্গত করিয়া দেন সেইরূপ এই নিখিল বিশ্বজগতের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে যে সমস্ত স্থূল বাহ্য ও সূক্ষ্মভূত, শক্তিসমূহ এবং সকল প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞান ব্রহ্মের প্রসুপ্তা প্রকৃতির মধ্যে অব্যক্ত কারণরূপে অবস্থিত ছিল তাহা বিশ্বসৃষ্টির বা অভিব্যক্তির সময় স্বতঃই বহির্গত হয়। আবার যেমন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সর্ব্বপ্রকার নদীর জল এক সমুদ্রেই প্রবাহিত হয় তেমন প্রলয়কালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তু এবং জ্ঞানরাশি সেই অনন্ত ব্রহ্মের প্রকৃতিতে লীন হয় ও তহাতেই সুপ্তরূপে অবস্থান করে ; এই ব্রহ্মরূপ অনন্ত সমুদ্রই সমস্ত জ্ঞানরাশি ও বাহ্য বস্তুনিচয়ের আধার এবং অন্তে এই সমস্তই আবার ঐ সমুদ্রেই মিশিয়া যায়।[১৬] "যেরূপ জিহ্বা দ্বারাই

১৬। "স যথা সর্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং সর্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং সর্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং সর্বেষাং রসানাং জিহ্বৈকায়নমেবং সর্বেষাং রূপাণাং চক্ষুরেকায়নমেবং সর্বেষাং

সর্ব্বপ্রকার স্বাদ গ্রহণ করা যায়, সর্ব্বপ্রকার স্পর্শ কেবল ত্বক্‌দ্বারা অনুভব করা যায়, সর্ব্বপ্রকার গন্ধমাত্র নাসিকা দ্বারাই অনুভূত হয়, বিভিন্ন প্রকার বর্ণ কেবল চক্ষু দ্বারাই দৃষ্ট হয়, সর্ব্বপ্রকার শব্দ মাত্র কর্ণদ্বারা শ্রুত হয়; যেমন মনই একমাত্র মানসিক ভাব রাশির আকর এবং সর্ব্বপ্রকার বিবেক বা বিচার জ্ঞানের একমাত্র আকর বুদ্ধি; যেমন সকল বিদ্যার আকর হৃদয়, সকল কর্ম্ম হস্তদ্বারা করা হয়, সকল সুখের আধার উপস্থ; যেমন পায়ু কেবল বিসর্গের মূলে থাকে, পদদ্বয় গমনাগমনের একমাত্র যন্ত্র, বাগযন্ত্র যেমন বেদোচ্চারণের মূলে আছে সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার অনুভূতি ও জ্ঞান সেই এক চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম বা আত্মা হইতেই উদ্ভাসিত হয়।”

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বুঝাইতেছেন যে, ব্রহ্মই সকল বস্তুর আদি ও অন্ত; অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর অভিব্যক্তি পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতেই হইতেছে এবং প্রলয়কালে

শব্দানাং শ্রোত্রমেকায়নমেবং সর্বেষাং সঙ্কল্পানাং মন একায়নমেবং সার্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নমেবং সর্বেষাং কর্ম্মণাং হস্তাবেকায়নমেবং সর্বেষাং আনন্দানামুপস্থ একায়নমেবং সর্বেষাং *বিসর্গানাং পায়ুরেকায়নমেবং সর্বেষামধ্বনাং পাদাবেকায়নমেবং সর্বেষাং বেদানাং বাগেকায়নম্॥”—বৃহদারণ্যক ৪।৫।১২

সমস্তই আবার সেই পরমাত্মাতেই লীন হইতেছে। এই ব্রহ্ম যেন এক অদ্বিতীয় চৈতন্যঘনের মূর্ত্ত রূপ, ইহাতে অপর কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই। ইহাকে বহু বস্তুর সমষ্টি বলা যায় না। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে : "যেমন এক তাল লবণের ভিতরের মধ্যভাগের ও বহির্ভাগের মধ্যে কোনও তারতম্য নাই, কিন্তু উহার সর্ব্বত্রই লবণের স্বাদ বর্ত্তমান থাকে তেমন ব্রহ্মেরও মধ্যপ্রদেশ বা বহিঃপ্রদেশের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই; উহা জ্ঞানের ঘনীভূত অসীম পদার্থের স্বরূপ। তাহার আদিও নাই, অন্তও নাই; এবং তাহা অসীম।"[১৭] এই অসীম ও অনন্ত বস্তুর দুইটি ভাব আছে : একটি সমষ্টি ভাব যাহাকে 'ব্রহ্ম' বলা হয় এবং অপরটির ব্যষ্টিভাব যাহাকে 'জীবাত্মা' বলা হয়। 'অহং'-জ্ঞানের উৎসরূপে, অর্থাৎ 'আমি আছি' এই জ্ঞানের মূলস্বরূপ ইনি ব্যষ্টিভাবে আমাদের দেহেন্দ্রিয়াদির সংযোগে বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হন। আবার যখন এই আত্মা মৃত্যুর সময় স্থূল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হন তখন

১৭। "স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৩

ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয়গুলিকে গ্রহণ করিতে বিরত হয় এবং মাত্রাগুলি যে স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল সেই কারণ অবস্থায় প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়। মৃত্যুর পরে কেহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদিকে আর গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন: "প্রিয়ে, যদিও আমি তোমার নিকট বলিয়াছি যে, আত্মা অখণ্ড স্বরূপ তথাপি ইহা মনে রাখিও যে, যখন আত্মা এই দেহ হইতে চলিয়া যান তখন তাহার মর্ত্ত্যলোকের ন্যায় জ্ঞান থাকে না। তখন আত্মার ইন্দ্রিয়রাজ্যের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন: "প্রভু, আপনি যে বলিলেন 'মৃত্যুর পরে ঐ অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ আত্মার মর্ত্ত্যলোকের ন্যায় জ্ঞান থাকে না' এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি। ইহা কিরূপে হইতে পারে?"[১৮] যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন: "প্রিয়ে, আমি তোমাকে হতবুদ্ধি হইবার কথা তো কিছুই বলি নাই; অবিনাশিত্বই আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম।"[১৯]

১৮। "সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবান্ মোহান্তমাপীপিপন্ন বা অহমিমং বিজানামীতি॥"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৪

১৯। "স হোবাচ ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মাঽনুচ্ছিত্তিধর্মা॥"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৪

তোমার সমস্যা সমাধান করিবার জন্য আমি উহা পুনরায় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতেছি। আত্মা স্বতঃই মৃত্যুরহিত ও অমর। "যতক্ষণ বিষয়ী জ্ঞাতা ও বিষয় জ্ঞেয়রূপে দ্বৈতভাবে বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ অনুভবযোগ্য জ্ঞেয় বিষয় ও অনুভবকর্ত্তা জ্ঞাতা পৃথক্ থাকেন ততক্ষণ সেই জ্ঞাতা দর্শন করেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি অনুভব করেন, ঘ্রাণ, আস্বাদ, স্পর্শ ও চিন্তা ইত্যাদি করিয়া থাকেন এবং সেই সকল বিষয়কে জানিতে পারেন।"[২০]

দেহ ও আমি-জ্ঞানযুক্ত আত্মা যতক্ষণ উক্ত প্রকার দ্বৈত ভূমিতে বা আপেক্ষিক রাজ্যে থাকেন ততক্ষণই তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের অনুভূতি হয়। যখন দ্রষ্টার দৃশ্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধ থাকে তখনই তাহার দর্শনের অনুভূতি সম্ভব হইতে পারে। যে গন্ধ-দ্রব্যের সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই তাহার আঘ্রাণ আমরা কিরূপে পাইতে পারি? আস্বাদনীয় বা শ্রোতব্য বিষয়ের সহিত জ্ঞাতার (আত্মার) কোনও সম্বন্ধ না থাকিলে ঐ বিষয়ের অনুভূতিই হইবে না। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনুভবযোগ্য বিষয়ের

২০। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতিতদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং রসয়তে, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং স্পৃশতি, তদিতর ইতরং বিজানাতি॥"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৫

সহিত অনুভব-কর্ত্তার আপেক্ষিক সম্বন্ধ না থাকিলে কোনও প্রকার অনুভূতির উদয় হওয়া সম্ভবপর হয় না। আবার যখন আমরা গভীর নিদ্রায় সুষুপ্তিতে অভিভূত থাকি তখন আমরা দর্শন করি না, শ্রবণ করি না, আস্বাদন করি না, আঘ্রাণও করি না, বা কিছু বুঝিতেও সক্ষম হই না। জ্ঞেয় বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়রাজ্যেই অবস্থান করে, সুতরাং যখন আমরা অতীন্দ্রিয় ভূমিতে অবস্থান করি অর্থাৎ যে ভূমিতে দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ইত্যাদি ব্যাপার নাই সেই স্থানে কিরূপে দর্শনাদি ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়া সম্ভবপর হইতে পারে ?

স্বপ্নশূন্য নিদ্রায়, অর্থাৎ সুষপ্তি অবস্থায় প্রত্যেকের একই প্রকার উপলব্ধি হয়; এই অবস্থায় স্ত্রীজাতি বা পুরুষ-জাতির মধ্যে উপলব্ধির কোনও ভেদ দেখা যায় না। "ঐ অবস্থায় পিতা অপিতা হন, অর্থাৎ পিতার পিতৃত্ব থাকে না ও মাতার মাতৃত্ব থাকে না।"[২১] আবার সমাধি অবস্থায় অর্থাৎ "যেখানে দ্বৈতভাব বা বহুত্ব ভাবের সম্পূর্ণ অভাব এবং যেখানে কেবল এক অনন্ত জ্ঞানসমুদ্র বিদ্যমান সেখানে দর্শনই বা কি হইবে, আঘ্রাণ করিবার বিষয় বা কি থাকিবে এবং আস্বাদনই বা কিসের হইবে?"[২২]

২১। "অত্র পিতাঽপিতা ভবতি, মাতাঽমাতা" ইত্যাদি শ্রুতিতে আছে।—বৃহদারণ্যক ৪।৩.২২

২২। "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন

যেখানে আপেক্ষিকতার অস্তিত্ব নাই বা যেখানে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় কিছুই নাই সেখানে দর্শন-স্পর্শনাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? যাহার সাহায্য ব্যতীত কিছুই জানা যায় না তাহাকে কিরূপে জানিতে পারা সম্ভব?

যে আত্মা সকল বস্তু বা বিষয়ের একমাত্র জ্ঞাতা, অর্থাৎ যিনি সকল বস্তু বা বিষয়ের সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেন সেই আত্মাকে আবার কোন্ জ্ঞান্শক্তি অবগত করাইতে পারে? না, তাহা জানিবার জন্য আর কোন দ্বিতীয় জ্ঞান নাই, কারণ আত্মাই এই নিখিল বিশ্বজগতের একমাত্র জ্ঞাতা।

এখন দেখিতে হইবে যে, আত্মাকে বিদিত হইবার প্রশস্ত উপায় কি? যথাযথ বিশ্লেষণ ও বিচারের দ্বারা আমরা জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তু হইতে প্রকৃত জ্ঞাতা পুরুষকে পৃথক্‌ভাবে বুঝিতে পারি; প্রত্যেক বস্তুকেই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে এবং মনে মনে 'নেতি নেতি'[২৩] অর্থাৎ "ইহা আত্মা নহে, বা আত্মা ইহাও

কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং রসয়েৎ, তৎ কেন কমভিবদেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং স্পৃশেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্, যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ।"
—বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৫

২৩। "স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো ন হি

নহে” এইরূপ স্থির করিয়া যাহা আত্মা নহে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞেয় পদার্থগুলি, সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতি, সর্ব্বপ্রকার চিন্তা এবং মনের ভাব ও বুদ্ধির যাবতীয় ক্রিয়া শুদ্ধ-বিচারের দ্বারা চিত্ত হইতে একে একে অপসারিত হইলে সমাধি অবস্থায় আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়।

বুদ্ধি যতই সূক্ষ্ম হউক না কেন তাহার দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না, ‘আত্মা’ বুদ্ধির অগোচর। আত্মাকে কেহ নাশ করিতে পারে না, ইহা অমর; কেহ কোন উপায়ে আত্মার পরিবর্ত্তন সাধিত করিতে পারে না, ইহা অপরিবর্ত্তনশীল; আত্মাকে কিছুর দ্বারা স্পর্শ করিতে পারা যায় না, ইহা অস্পর্শ্য; আত্মার কোনও প্রকার বন্ধন নাই, ইহা নিত্য মুক্ত। আত্মার সুখ নাই, শোক নাই, দুঃখ নাই, ইহা সুখদুঃখের অতীত। আত্মা সর্ব্বদাই সমভাবে একরূপ বর্ত্তমান আছেন। “প্রিয়ে, যে আত্মার ধর্ম্ম এই প্রকার সেই আত্মাকে কি উপায়ে এবং কাহার দ্বারাই বা জ্ঞাত হইতে পারা

শীর্য্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি, বিজ্ঞাতার-মরে কেন বিজানীয়াদিত্যুক্তানুশাসনাসি মৈত্রেয্যেতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার ॥”—বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৫

যায়? মৈত্রেয়ী, আত্মার স্বরূপ যাহা বলিলাম বাক্যের দ্বারা তাহা এই পর্য্যন্তই বর্ণনা করা যায়; ইহার অতীত যাহা কিছু আছে এবং যে জ্ঞানের দ্বারা অমরত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা এক মাত্র সেই সমাধি অবস্থায় উপলব্ধি হইয়া থাকে। প্রেমের, জ্ঞানের, আনন্দের এবং সত্যের আধার বা মূল সেই আত্মাকে বিদিত হইলেই অমরত্ব লাভ হইয়া থাকে।" এই উপদেশ প্রদান করিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য অরণ্যে প্রস্থান করিলেন এবং সেখানে তিনি সেই নিত্যবস্তুর ধ্যানে কালযাপন করিতে লাগিলেন; অবশেষে সমাধি অবস্থায় তিনি আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া অমরত্ব লাভ করিলেন। মানব জীবনের একমাত্র চরম উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান লাভ, যাহার দ্বারা আমরা এই বিশ্বকে সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে পারি; একমাত্র আত্মজ্ঞানের সাহায্যেই এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সম্বন্ধে সমস্ত রহস্যই ভেদ করা যায়। যিনি আত্মদর্শন করিয়াছেন তিনি প্রলয়কালে জাগতিক বস্তুসমূহের কি হইবে তাহা সম্যকভাবে বুঝিতে পারেন। অমরত্ব লাভ করিতে অভিলাষী হইলে এই 'আত্মাকে' জানিতে হইবে; ইহা ব্যতীত আর অন্য কোনও উপায় নাই।

আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া বৈদিক ঋষি ঘোষণা করিয়াছেন:

সমস্ত অজ্ঞান-অন্ধকারের পরপারে অবস্থিত স্বয়ংপ্রকাশ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ মহান্ আত্মাকে আমি জানিয়াছি; একমাত্র তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়। ইহাছাড়া আর অন্য কোন পন্থা নাই; অন্য কোন পন্থা নাই।"[২৪]

২৪। "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"
—শ্বেতাশ্বেতর উপনিষৎ ৩।৮